সঞ্চিতা

শারদ সংখ্যা ১৪২৪

পুরুলিয়া শহর থেকে প্রকাশিত একমাত্র ছোটদের পত্রিকা

ছোটদের পূজাবার্ষিকী ১৪২৪ | ২৩ বর্ষ, অক্টোবর ২০১৭

সাক্ষিতা

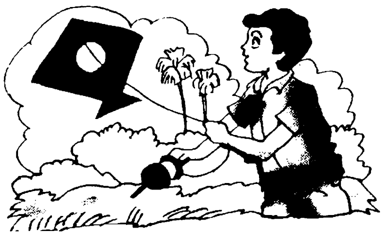

সম্পাদক

তরুণকুমার সরখেল

মুক্তাঙ্গন
আমডিহা, ডাক- দুলমি নডিহা
জেলা- পুরুলিয়া, ৭২৩১০২

e-mail:
sarkheltarun126@gmail.com

অলংকরণ

অবি সরকার ও প্রণব হোড়

প্রচ্ছদ

নচিকেতা মাহাত

নামাঙ্কন

দিগম্বর দাশগুপ্ত

মুদ্রণ সহযোগিতায়

বাবা লোকনাথ কম্পিউটার অ্যান্ড
অফসেট প্রিন্টিং মঠ
বি টি সরকার রোড, পুরুলিয়া

মূল্যঃ ৪০ টাকা

সূ চি প ত্র

ছোটদের পাতা

✷ প্রবাহনীল দাস সোহিনী নন্দী তনুব্রত সরখেল - ৬০।

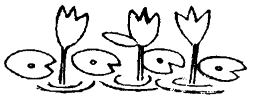

নিবন্ধ

✷ অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় - ২৩।

ছড়া ও কবিতা

✷ ভবানীপ্রসাদ মজুমদার - ৫, রতনতনু ঘাটী সুখেন্দু মজুমদার পঞ্চানন মালাকর বিষ্ণু সামন্ত ৬, দীপ মুখোপাধ্যায় মালিপাখি শৈলেন্দ্র হালদার জয়নাল আবেদিন -৭, মানস সরকার মনোরঞ্জন পুরকাইত অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুনীতি মুখোপাধ্যায় সলিলরঞ্জন দাশগুপ্ত -৮, হাননান আহসান অপূর্বকুমার কুণ্ডু রূপক চট্টরাজ সৌমিত্র মজুমদার- ১১, শীতল চট্টোপাধ্যায় মহসীন মল্লিক -১৪, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত -১৬, অবি সরকার-২৯, দেবজ্যোতি ভটাচার্য উৎপলকুমার ধারা জগদীশচন্দ্র সরখেল -১৮, বাবিন দুর্গাচরণ ঘোষ মলয়কুমার হালদার বনশ্রী মিত্র -১৭, সুপর্ণা ভৌমিক চক্রবর্তী শাঁওলি দে - ২১, শ্যামাচরণ কর্মকার প্রদীপকুমার সামন্ত -২১, অনিতা অধিকারী সুভাষ মুখোপাধ্যায় - ২৪, সতীশ বিশ্বাস সলিল মিত্র তপনকুমার বৈরাগ্য -২৫, ফণিভূষণ হালদার মোহাম্মদ আলী বুলবুল- ২৯, মনোরঞ্জন গরাই উদয়ন হাজরা নয়নতারা তরণী পাত্র মানস দরিপা বিধান শীল নূপুর সরখেল- ৬৪।

কমিক্স

✷ প্রণব হোড়-২২, ২৮, ৩২। শুভ- ৩১।

লিমেরিক

✷ রামচন্দ্র ধাড়া- ৩৯।

গল্প

✷ দেবদুলাল কুণ্ডু - ৭৪, সুনির্মল চক্রবর্তী-৯, অনন্যা দাশ-১২, চুনী দাশ- ৭৩, ভাস্কর বাগচী- ৭৯, সমাজ বসু- ১৫, তপনকুমার দাস-১৯, সুমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- ৪২, অমল ত্রিবেদী- ৫০, সুচিত চক্রবর্তী-৫৪, অমিতাভ শঙ্কর রায়চৌধুরী - ৫৫ চুনীলাল রায় -৫৭, অরিজিৎ পাত্র- ৬৬, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় দাস - ৬৮, সমরকুমার চট্টোপাধ্যায়- ৭১, তরুণকুমার সরখেল-৮৩।

বাংলাদেশের ছড়া ও কবিতা

* ইমরান পরশ নাসিরুদ্দীন তুসী আসলাম সানী-২৬, নীহার মোশারফ জ্যোতির্ময় মল্লিক নাজমুল হাসান জসীম মেহবুব মাহবুবুল হাসান-২৭।

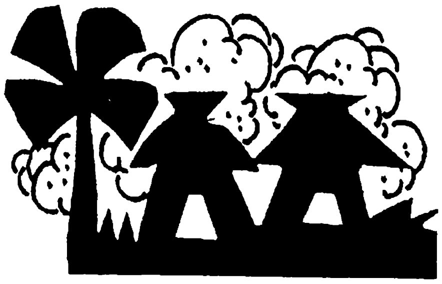

বাংলাদেশের গল্প

* খন্দকার মাহমুদুল হাসান-৫২।

সিনেমার গল্প

* প্রণব হোড়-৩৮।

ছড়া ও কবিতা

* তনুশ্রী চন্দ্র উত্থানপদ বিজলী ত্রিদিব ঘোষ রায় বসুন্ধরা মাজি -৪৯, অজয় মাজি লালমোহন ভট্টাচার্য - ৮০, বদ্রীনাথ পাল সুপ্রকাশ আচার্য - ৫৬, কাজল দাস নিতাইচন্দ্র রজক - ৫৯, স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায় অরুণ মন্ডল সুদীপ চৌধুরী শ্যামাচরণ কর্মকার প্রদীপকুমার সামন্ত তাপস চক্রবর্তী- ৬৩, নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত শেখ গোলাম মাবুদ -৭৮।

গল্প

* সৈয়দ রেজাউল করিম- ৬১, ভাস্কর বাগচী-৭৯।

ছড়া ও কবিতা

* ঈলিতা চট্টোপাধ্যায় সুমিতকুমার বেরা শঙ্করকুমার চক্রবর্তী অসিত দলপতি -৩০, গোপাল কুম্ভকার-৩১, মদন চক্রবর্তী তপোন দাশ প্রবীর জানা রমেন রায় পরিমল ঘোষ রণজিৎ হালদার -৩৩, তপনকুমার দাস অঙ্কিতা আচার্য উপাসনা পুরকায়স্থ দীনেশচন্দ্র আচার্য শীলা মুখোপাধ্যায় কাশীনাথ মোদক -৩৪, পার্থ সিনহা বিকাশ পন্ডিত প্রেমাঙ্কুর মালাকার পঞ্চানন বসু মল্লিক ৩৫, কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় সুচন্দ্রনাথ দাস শীলা সরকার দুর্গাদাস পাল - ৩৬, অচিন্ত্য সুরাল সোমনাথ ভটাচার্য অনিরুদ্ধ ডাঙ্গুরিয়া রূপালী গোস্বামী সমীরণ দত্ত অনুকূল মন্ডল- ৩৭, বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস কাজী শাহাদাত আলী নুরজামান শাহ রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক সুকান্ত ঘোষ রাজীব মিত্র -৪০, সুমন বিশ্বাস ব্রজেন্দ্রনাথ ধর তারাশঙ্কর চক্রবর্তী সঞ্জয় কর্মকার মেধস ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় গৌতম বিশ্বাস-৪১, সোমনাথ চক্রবর্তী স্বপন চক্রবর্তী - ৪৩, প্রদীপ চৌধুরী-৮০, শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী স্বপনকুমার বিজলী দুর্গাদাস পাল নীলাকাশ বসু - ৬৫।

নাটক

* শুভজিৎ বরকন্দাজ - ৪৪।

ভ্রমণ

* সৌম্যনারায়ণ আচার্য- ৮১।

ছোটদের বই ও সংকলন- আলোচনাঃ ৮৪।

অঙ্কের ভূত

তরুণকুমার সরখেল
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
অবি সরকার
দাম ঃ ৫০ টাকা।

মজা রাশি-রাশি

ক্লাস সেভেনের মতিরামের অঙ্কে বড় ভয়। প্রায়ই তাকে হেনস্থা হতে হয় 'অঙ্কের জাহাজ' বিপদতারণস্যারের হাতে। একদিন মতি এমন বুদ্ধি বরে করল, যাতে সহজ করে অঙ্ক শেখানোর সংকল্প নিতে বাধ্য হলেন বিপদতারণস্যার। এদিকে ডিসেম্বরের হাড়কাঁপানি শীতে মুচকুন্দপুর গ্রামে রুগি দেখতে গিয়ে ঠাকুরদা পড়লেন রকমারি ভূতের পাল্লায়। ছেলেধরা ভেবে বাঁশিবাজানো যাদুকরকে মেরে আধমরা করে দিল গ্রামের লোক। জুতো চুরি গেল ভূতোমামার। রহস্যের সমাধান হল সোনার কলমের। কথা বলা ময়না পাখির জন্য সুমনের মন খারাপ করল। এত সব ঘটনা নিয়েই তরুণকুমার সরখেল লিখে ফেললেন মজার একটি বই অঙ্কের ভূত।

আনন্দমেলা
২০ শে এপ্রিল ২০১৪

তরুণকুমার সরখেল ছোটদের মন বোঝেন ভালোই। গ্রামবাংলার প্রকৃতি, স্কুল জীবনের ছবি, মাঠ থেকে ইঁদুরের ধান বের করার কৌশল ইত্যাদি নিয়ে মোট ২৬ টি গল্প আছে বইটিতে । 'অঙ্কের ভূত', 'ঘুম নেই হরিমোহনবাবুর', 'ঠাকুরদার রকমারি ভূত', 'দুখিরাম'-এর মতো গল্পগুলি পাঠককে আনন্দ দেবে। গোয়েন্দা কাহিনি, সায়েন্স ফিকশন আর রহস্যগল্পও আছে।

সাপ্তাহিক বর্তমান
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

তরুণকুমার সরখেল-এর ছোটদের বই

অলৌকিক ছাতা
মজার মেরিক
ভূতোমামার জুতো
এক পকেট লিমেরিক
মেজমামার ছাতা
হাতি দাদার সাঁকো
সাঁতরাগাছির সতুমামা
ছড়ার ঢাক দিচ্ছে ডাক
ভূতের ঘরে ভুতো
আড়িয়াদহের পুড়িয়াবাবা
লিমেরিক জিন্দাবাদ
তাইরে নাইরে নাই
উদভট্টম
সেঞ্চুরি মেরিক
ইচ্ছে করে
সোনারুপোর চাঁদ
তরুণের ছড়া
ব্যাঙের পাঠশালা
শিবু আংকেল
এক পকেট ভূত
লেজকাটা শেয়াল
ছোটদের গল্প
অঙ্কের ভূত
একটি কিশোর একা
ম্যাজিক ছাতা
এক ডজন গল্প
এক ডজন হাসির
প্রজাপতির দেশে
পুরুলিয়া মেরিক
নীল ঘুড়ি
ছত্রিশ মেরিক
হলুদফুলের হাসি

সব দুর্গাই থাকুক সুখে

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

এক দুর্গা রিক্সা চালায় কুচবিহারের হাটে
এক দুর্গা একশো দিনের কাজে মাটি কাটে।
এক দুর্গা রাস্তা বানায় পিচ ও পাথর ঢালে
এক দুর্গা রোজ চুনো মাছ ধরছে বিলে-খালে।
এক দুর্গা করছে মাঠে দিনমজুরের কাজ
এক দুর্গা খিদেয় কাঁদে, পায়নি খেতে আজ।
সবাই জানি, এদের কারো হয়না কোনও পুজো
এরা তো মা তোমার মতো নয়কো দশভুজো।
সব দুর্গার চোখে-মুখেই ফুটবে হাসি কবে ?
মাগো, তোমার পুজো সেদিন সত্যি সফল হবে।

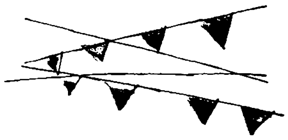

এক দুর্গা পাথর ভাঙে রোজই আসানসোলে
এক দুর্গা পেটের জ্বালায় খনিতে কয়লা তোলে।
এক দুর্গা সাত-আট বাড়ি কষ্টে বাসন মাজে
এক দুর্গা কারখানাতে ব্যস্ত নানান কাজে।
এক দুর্গা চা-বাগানে তোলে চায়ের পাতা
এক দুর্গা পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরেই সারায় ছাতা।
সবাই জানি, এদের কারো হয়না কোথাও পুজো
তাই বলি মা, এদের চোখেও পুজোর খুশি খুঁজো
সব দুর্গার চোখে-মুখেই ফুটবে হাসি যবে
মাগো, তোমার পুজো সেদিন সত্যি সফল হবে।

এক দুর্গা হাসপাতালের সবার চেনা আয়া
এক দুর্গা নার্সদিদি, তাঁর মনে ভীষণ মায়া।
এক দুর্গা সবজি বেচে নিজের পায়ে দাঁড়ায়
এক দুর্গা মুরগি কাটে, নিজেই পালক ছাড়ায়।
এক দুর্গা হোটেল চালায়, বানায় মাংস-ভাত
এক দুর্গা বুট-পালিশে জোরসে চালায় হাত।
এমনি হাজার দুর্গা যারা পায়না কোনও পুজো
এদের দুঃখ-কষ্ট তুমিই দরদ দিয়ে বুঝো।
সব দুর্গার চোখে-মুখেই ফুটলে হাসি তবে
মাগো, তোমার পুজো সেদিন সত্যি সফল হবে।

অঙ্কে কাঁচা
রতনতনু ঘাটী

ও সাদা মেঘ, দাঁড়াও দাঁড়াও, বলছি শোনো —
হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তোমায় বলছি,
এক্ষুনি কই একশো থেকে একুশ গোনো।

পারলে না তো, জানতাম তা পারবে না ঠিক !
এতই যদি পদ্য পড়ো
মেলাও দেখি দিকের সঙ্গে দিগ্বিদিক।

তাও পারো না, দিগ্বিদিক কি মানুষ হয় ?
এতোল তুমি বেতোল হলে ?
মাদাগাস্কার দ্বীপ না হলে, নদী তো নয় !

ও সাদা মেঘ, আকাশ-খাতায় লিখছ এ কী
হলুদ রঙের কমল দিয়ে ?
অঙ্কে শূন্য ! তিন দু'গুণে সাত হয় কি ?

শূন্যে তুমি হাত বাড়িয়ে ধরছ চাঁদও !
ও মেঘ তুমি অঙ্কে কাঁচা,
ছবির মেঘে বৃষ্টি হচ্ছে, এবার কাঁদো !

কেউ না বুঝুক
সুখেন্দু মজুমদার

সাঁঝ গেল যেই রাজের কাছে
গাছের পাতাও দিব্যি নাচে
এই বুঝি হিম নামবে গাছে
ঝুলিয়ে দিয়ে রূপোর জরি।

সেই জরিপথ পেরিয়ে গেলে
তেপান্তরের মাঠটা ফেলে
তবেই জানিস সত্যি মেলে
খেলাঘরের আকাশপরি।

আকাশপরির ওড়না ভাসে
তেপান্তরের মেঘ-বাতাসে
লাগিয়ে চমক খবর আসে
দিচ্ছে উঁকি রোদের ঘোড়া।

গাছের পাতায় দাঁড়িয়ে ও যে •
কেউ না বুঝুক, তাও সে বোঝে
স্বপ্নকুসুম আলোর খোঁজে
পথ যে রাঙাধুলোয় মোড়া।

ভজা ডাকাতের চেলা
পঞ্চানন মালাকর

লোকটা ভীষণ তাগড়াই আর
অল্প বয়স মস্ত জোয়ান,
পাড়ার মধ্যে লোকটাকে তাই
খাতির করে রাম পালোয়ান।

কারণ কুস্তির আখড়ায় রোজ
দেখায় অনেক প্যাঁচপয়জার,
ভয় করে খুব পাড়ার সবাই
কেউ ঘেঁষে না ধারে কাছে তার।

কেউ বলে রোজ স্নানের আগে
গায়ে মাখে নাকি দশ কেজি তেল,
তেলে চুপ চুপে শরীরটা তার
দেখায় তখন বড়ো বিটকেল।

কেউ বলে ওই লোকটাকে ভাই
ভালো করে দেখো এই বেলা,
ওই লোকটাই বড়ো নিষ্ঠুর
ভজা ডাকাতের সেই চেলা।

লোকটাকে নিয়ে গুজব রটাতে
কেউ কিছুতেই যায় না কম,
দোষ গুণ নিয়ে সারাদিন রাত
পাড়ায় রটনা চলে হরদম।

লোকটাকে নিয়ে মানুষেরা করে
কানাঘুষো জোর দুই বেলা,
পাড়াতেই থাকে আসলে লোকটা
ভজা ডাকাতের খোদ চেলা।

পুতুল
বিষ্ণু সামন্ত

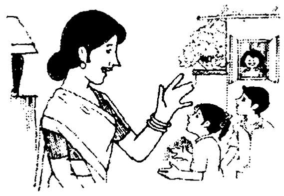

পুতুল-পুতুল মেয়েটি যে পুতুল নিয়ে খেলে,
আর কিছু সে চায় না মোটে একটি পুতুল পেলে।

নিজের খাওয়া-নাওয়া ফেলে পুতুলটিকে নিয়ে —
নাওয়ায় খাওয়ায় শোওয়ায় পাশে মাদুর পেতে দিয়ে।

তারপরে যায় এ-ঘর সে-ঘর খুঁজে বেড়ায় মাকে,
'পুতুল কোথায় গেলি' বলে মা তখনই ডাকে।

একটু পরেই

দীপ মুখোপাধ্যায়

জঙ্গলবনে গন্ধে ভরা ফুল ছিল
ঘাসপাতাদের ফাঁক ফোকরে
একটা দুটো ফড়িং ওড়ে
জল থই থই পদ্মপুকুর —
খেজুরছায়া আপনমনে দুলছিল।

সবুজ গাছে যথেষ্ঠ ফল-মূল ছিল
রোদ বেছানো নীল আকাশে
মেঘ ভেসে যায় কি উচ্ছ্বাসে
সবকিছু জলছবির মতন
এই দুচোখে দৃশ্যগুলো ভুল ছিল ?

সূর্যি তখন ঘুমন্তদের তুলছিল
উপচে পড়ে ঘাসবিছানায়
ঝিরকি কাটে পাখির ডানায়
অল্পতো আলো ঢুকবে বলে
বন্ধ ঘরে দরজাগুলো খুলছিল।

যেসব লোকে ঘুমের ঘোরে ঢুলছিল
সাতসকালে মোরগ ডাকে
ভাঙবে তারা আড়মোড়াকে
রাস্তাতে আমিও যাব
কারণ, আমার একটু পরেই স্কুল ছিল।

অক্কর বক্কর

মালিপাখি

নবীন=নতুন, করী=হাতি, পথিক=পান্থ
তাতাই ভীষণ শান্ত

নফর=চাকর, উডু=তারা, নয়ন=অক্ষি
কোকিল গায়ক পক্ষি

গগন=আকাশ,ঋষি=মুনি, বগল=কক্ষ
বাজায় তাতন শঙ্খ

পরখ=যাচাই, সাঁকো=সেতু, শোধন=শুদ্ধি
পুনুর অনেক বুদ্ধি

গোকীল=লাঙল, ছড়ি=লাঠি, ছুতোর=তক্ষা
আমার পকেট ফক্কা

সবার সেরা দামি

শৈলেন্দ্র হালদার

লাভ কী বেঁচে এই পৃথিবীর আমরা যদি ভাগ না পাই,
দাম দিয়ে সব কিনতে হবে ? একটু যদি মাগনা পাই —
কী যে ভাল হবেই রে ভাই, সক্কলকার জন্য,
রোদ বৃষ্টি আলো বাতাস দাওনা ক্ষুধার অন্ন।

লাবণ্যময় জীবন তো চাই, আয় রে দামাল হাওয়া,
বুকের মধ্যে টানছি তোকে সেই তো পরম পাওয়া।
কাঁচা সোনার রোদ্দুরও দেয় আলোর হাসি ঠোঁটে,
বিশ্বভরা প্রাণের মাঝে সুয্যিঠাকুর ওঠে।

বাগনে ফুল ফোটে এবং বৃষ্টিধোয়া জলে—
গাছপালা মাঠ থৈ থৈ থৈ , বাঁচার ফসল ফলে।
মিষ্টি বাতাস চাঁদের হাসি বরফ জলের নদী,
জোছনা ভরা অরণ্যপথ সাগর নিরবধি...

দারুণ দামি জিনিস গুলোই পাচ্ছি তো সব ফ্রিতে,
বাঁচার মত বাঁচতেও চাই মহান পৃথিবীতে।
অবাক কান্ড, ভীষণ দামি, হিরে-মোতির গয়না,
রাখতে পারো সিন্ধুকেই, বন্ধু তো আর হয়না।

সবার সেরা দামি জিনিস, লিখছি খাতার পাতায় :
আমার মায়ের ভালবাসা বোনেন নকশি-কাঁথায়।

ভূতুড়ে

জয়নাল আবেদিন

চোখ বুঁজেছি ঘরবাড়ি নেই
সামনে এসে নাচছে তা ধেই
কথা বন্ধ হাত-পা অবশ
হাঁটছে বুঝি পাতা খসখস
পুঁতেই গেছি হয়েছি কাঠ
বুক ধড়ফড় এ মাঠ ও মাঠ
চেঁচিয়ে ওঠে নড়বি নাকো
এগিয়ে এলো বিশাল সাঁকো
হাত পা ছুড়ি, কাশতে গেলে
সাঁকোর নীচে দেয় যে ঠেলে
উড়ে আসছে আকাশ খানা
কখন কী হয় যায় না জানা
আবার দেখি মড়ার খুলি
বাঁকানো গোঁফ রং ও তুলি
চোখ বুঁজেছি আছে কী কেউ
ডাকছে কুকুর ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

দুর্গা আসবে
মানস সরকার

আকাশের নীলে মেঘের তাড়া
সময় নেই তো মোটে
দুর্গা আসবে দুর্গা আসবে
দিঘিতে শালুক ফোটে।

দুর্গা আসবে দুর্গা আসবে
চারিদিকে মশগুল
তাই শরতে খুশির ছোঁয়াতে
হেসে ফেলে কাশফুল।

দুর্গা আসবে দুর্গা আসলে
পড়াশোনা নেই আর
ছুটে ছুটে যাই প্যাণ্ডেলেতে
দেখে আসি বারবার।

দুর্গা আসবে দুর্গা আসলে
জ্বলবে বিজলি আলো
আবালবৃদ্ধ স্বভাব সিদ্ধ
মন হয়ে যায় ভালো।

দুর্গা আসবে সবাই সাজবে
নতুন জামা জুতো
কোথায় কেমন ঠাকুর হল
দেখে হবে অভিভূত।

দুর্গা আসবে দুর্গা সাজবে
শহর এবং গাঁ'য়
দিনরাত শুধু মানুষের ভিড়
হাওড়া-শেয়ালদায়।

এক থেকে দশ
মনোরঞ্জন পুরকাইত

এক এক্কে এক
মুঠো খুলেই দ্যাখ
দুই এক্কে দুই
মুঠোয় ভরা জুঁই
তিন এক্কে তিন
যাচ্ছে কেমন দিন
চার এক্কে চার
জীবনটা জেরবার
পাঁচ এক্কে পাঁচ
জ্যান্ত ভূতের নাচ
ছয় এক্কে ছয়
সইতে সবই হয়
সাত এক্কে সাত
দাও বাড়িয়ে হাত
আট এক্কে আট
নদীর পাড়ে ঘাট
নয় এক্কে নয়
একলা নদী বয়
দশ এক্কে দশ
ছড়া লিখেই যশ।

দুষ্টুমিষ্টু হাসি
অমেরন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছুটোছুটি হুটোপুটি
শুয়েও বিরাম নেই
এপাশে ওপাশে গুঁতোগুতি
শুধু উঠি উঠি
করে খুনসুটি ধরে বায়না
ঘুমোতে চায়না,
যেই মায়ের বকা খায়
চুপ হয়ে যায় ;
ঠাম্মা দ্যাখে চেয়ে
মেয়েটার দু-চোখ ছেয়ে
জড়িয়ে ঘুমের মাসি-পিসি...
ঠাম্মার আদর পেয়ে
ঘুমিয়ে পড়ল মেয়ে
চোখেমুখে দুষ্টুমিষ্টু হাসি।

বাজি নিয়ে
সুনীতি মুখোপাধ্যায়

বাজি ভাল লাগে খুবই
দেওয়ালিতে পোড়াতে,
ভাল লাগে হাউইকে
আকাশেতে ওড়াতে।
চরকি ভড়কি দিয়ে
ঘুরে ঘুরে পুড়ে যায়
আলোর বৃত্তগুলো
বন বন ঘুরে যায়।
ফুলকি-ফোয়ারা যেন
তুবড়িরা জ্বললে,
বাজির কি রাগ হয়
ছুঁচোবাজি বললে ?
ধড়িবাজি ভাল নয়,
তাকে বলে চালাকি,
ধাপ্পাবাজিও বাজে,
তাতে কম জ্বালা কি ?
ডিগবাজি লাগে ভাল
মাদারির খেলাতে,
'অ্যানুয়াল এগজাম'-এ
পড়া অবহেলাতে—
কেউ ডিগবাজি খেতে
নিশ্চয়ই চাও না ?
তবে ফাঁকিবাজিতে তো
হবেই তা পাওনা।

এক যে বানর
সলিলরঞ্জন দাশগুপ্ত

একটা বানর বসে ছিল সাঁকোর ধারে,
ইচ্ছে করেই লেজটা সে তার জোরে নাড়ে।

সাঁকো দিয়ে হচ্ছিল পার শান্ত ছেলে,
বানর তাকে দেখতে পেল দু'চোখ মেলে।

ঠোঙা ভরা বাদাম ছিল খোকার হাতে,
ঠোঙা কেড়ে নিয়ে বানর খেলায় মাতে।

এক এক করে বাদামগুলো বসে খেলো,
তাই না দেখে ছেলেটার খুব কান্না পেলো।

এক ছিল বুড়ি আর তার ছিল এক বেড়াল। বুড়ির আপনজন বলতে কেউ ছিল না। সঙ্গী বলতে তার ছিল ওই বেড়ালটাই। বুড়ি বেড়ালটাকে খুব ভালোবাসত। নিজে যা খেত তাই বেড়ালকে খেতে দিত। তবুও বলতেই হচ্ছে বেড়ালটা ভালো স্বভাবের ছিল না। সে আসলে ছিল এক দুষ্টু বেড়াল। চুরি বিদ্যেটা বেশ ভালোই শিখেছিল। বুড়ি একটু আড়াল হলেই ও রান্নাঘরে হানা দিত। মাছটা, মাংসটা যা-ই পেত, মুখে পুরে ছুটে পালাত। বুড়ি তার খোঁজও পেত না।

বেড়ালটা ঘরে কাজ করত না, তা নয়। নেংটি ইঁদুরের উৎপাত বেড়েছে। বেড়াল ওদের ভয় দেখাত, কাছে আসতে দিত না। বজ্জাত গুলোকে সামলানো সহজ কাজ নয়। বুড়ি এসব বুঝত বলেই বেড়ালটাকে কাছে ডেকে নিত, বলত, আর দুষ্টুমি করবি না, এই শেষবারের মতো বললাম। নয়তো তোর একদিন কি আমার একদিন।

বুড়ির কথা বেড়ালের কানে যে যায়নি তা কয়েকদিন পরেই বোঝা গেল। একদিন বুড়ির ইচ্ছে হয়েছে দুধ দিয়ে কিছু নকশী পিঠে বানাবে, তারপর কয়েকদিন বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাবে। এদিকে ঘরে দুধ নেই, পাড়াপড়শির কাছে থেকে চেয়েচিন্তে এক বাটি দুধ জোগাড় হয়েছে। বুড়ির মনটা তখনই ভালো হয় গেছে। বাটির দুধ রান্নাঘরে রেখে বুড়ি গেছে কাঠের খোঁজে। বেড়াল সেখানে ঘুর ঘুর করছিল। সুযোগ বুঝে বেড়ালটা একাই দুধ খেয়ে শেষ করেছে। বেড়াল হাই তুলছে। বেড়ালের দারুণ মজা।

কিছুপরে কাঠ জোগাড় করে বুড়ি ফিরেছে। বাটির দিকে চোখ পড়েছে। ও মা ! বাটি আছে, দুধ নেই। তখনই বুড়ির রাগ মাথায় চড়ে বসেছে। মেঝেয় পড়েছিল মাছ কাটার বঁটি। বঁটি দিয়ে বেড়ালটার লেজ কেটেছে । এমনটি হবে বেড়াল বোঝেনি। রক্ত ঝরে পড়ছে কাটা জায়গা থেকে। আর তখনই বেড়ালের কী চৎকার !

—মিঁয়াও মিঁয়াও আমার লেজ ফেরত দাও। নইলে ভালো হবে না। বুড়িও কম যায় না। বলে, চোর কোথাকার। এক্ষুনি ভাগ বাড়ি থেকে। তোর মুখও দেখতে চাই না। তোকে আমার কোনো দরকারও নেই।

বেড়াল তবুও বলে যায় : মিঁয়াও মিঁয়াও, কেন যে কাঁদাও ! মিঁয়াও মিঁয়াও লেজটা তো দাও।

বুড়ি তখন বলছে, আমার দুধ ফেরত দে, তারপর তোর কাটা লেজ সেলাই করে দেব। বেড়াল মিউ মিউ করে বলছে, তা কী করে হবে বুড়িমা ? সব দুধ তো পেটে গেছে। কীভাবে তোমাকে দুধ ফেরত দিই বলো ?

বুড়ির মাথাতেও আসে না কী করে কাটা লেজ ফিরিয়ে দেবে। তবু বলে, দুধের বাটিটা নিয়ে এখনই মাঠে যা। ওখানে ভেড়িরা ঘাসপাতা খাচ্ছে। ভেড়িদের কাছে চেয়েচিন্তে এক বাটি দুধ নিয়ে আয়। তারপর তোর লেজ নিয়ে ভেবে দেখব।

বেড়াল তখনই দৌড়েছে মাঠের দিকে। মাঠে এসে হাঁপাচ্ছে। এক ভেড়িকে সামনে পেয়ে বলছে, আমাকে বাঁচাও লক্ষ্মীটি। আমার কিছু দুধ চাই, বুড়িমাকে দেব। তবে সে আমার কাটালেজটা সেলাই করে দেবে বলেছে।

বুড়িমার বেড়াল

সুনির্মল চক্রবর্তী

ভেড়ি বেড়ালটাকে ভালো করে দেখছে। সত্যিই তো বেড়ালের লেজ কাটা। নিশ্চয়ই বুড়িমা কেটে দিয়েছে। আহারে! বেচারির কাটা লেজ থেকে রক্তও ঝরছে। কী বিপদ!

ভেড়ি তখনই বলছে, ওই যে দূরে, পাতাওয়ালা গাছটাকে দেখছ, ওর একটা ডাল নিয়ে এসো, তবেই তোমাকে দুধ দেব।

বেড়াল তখনই দৌড়েছে গাছের দিকে। গাছকে বলছে, গাছ ভাই গাছ ভাই একটা উপকার তো করো। পাতাওয়ালা একটা ডাল দেবে আমায় ? সেটা নিয়ে দেব ভেড়িকে। তবে সে খুশি হয়ে আমাকে কিছুটা দুধ দেবে। সেই দুধ দেব বুড়িমাকে । বুড়ি আমার কাটা লেজ সেলাই করে দেবে।

গাছ বেড়ালকে ভালো করে দেখছে। সত্যিই তো বেড়ালের লেজ কাটা। নিশ্চয়ই বুড়িমা কেটে দিয়েছে। আহারে! বেচারির কাটা লেজ থেকে রক্ত ঝরছে। কী বিপদ!

গাছ তখনই বলছে, ওই তো দূরে দেখছ একটা লোক লাঙল দিয়ে জমি চষছে। ওকে বলো কাছে এসে ও যেন আমার গোড়ায় নাড়ানির কাজ করে দেয় তবে বিটকেলে আগাছাদের থেকে বাঁচি। কাজ হয়ে গেলে তুমি পাতাওয়ালা একটা ডাল পেতেই পারো।

বেড়াল তখনই দৌড়েছে চাষির কাছে। ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে চাষিভাই চাষিভাই, একটা উপকার তো করো। পাতাওয়ালা গাছের গোড়ায় যদি নিড়ানির কাজ করে দাও, তাহলে গাছ বলেছে আমাকে একটা ডাল দেবে। সেই ডাল চেয়েছে ভেড়ি। ভেড়ি এখন মাঠে ঘাসপাতা খাচ্ছে ও বলেছে আমাকে এক বাটি দুধ দেবে। সেই দুধ দেব বড়িমাকে। তবে বুড়িমা আমার কাটা লেজ সেলাই করে দেবে।

চাষি বেড়ালকে ভালো করে দেখছে। সত্যিই তো বেড়ালের লেজকাটা । নিশ্চয়ই বুড়িমা কেটে দিয়েছে। আহারে, বেচারির কাটা লেজ থেকে রক্ত ঝরছে, কী বিপদ!

চাষির দয়ার শরীর। চাষের কাজ থামিয়ে বলছে, বুড়ো হয়েছি। খালি পায়ে হাঁটতে কষ্ট হয়। একবারটি মুচির কাছে যাও। এক জোড়া জুতো চেয়েচিন্তে আনো দেখি, তবেই যাব পাতাওয়ালা গাছের কাছে। গোড়াটা সাফসুফ করে দেব।

বেড়াল তখনই দৌড়েছে মুচির কাছে। ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে, মুচি ভাই মুচিভাই একটা উপকার তো করো। এক জোড়া নতুন জুতো আমার চাই। জুতো পেলে চাষি গাছের কাছে যাবে। নিড়ানির কাজ করে দেবে। গাছ তখন আমাকে একটা পাতাওয়ালা ডাল দেবে। সেই ডাল দেব ভেড়িকে। ভেড়ি এখন মাঠে ঘাসপাতা খাচ্ছে। ও তখন আমাকে একবাটি দুধ দেবে। সেই দুধ দেব বুড়িমাকে । তবে বুড়িমা আমার কাটা লেজ সেলাই করে দেবে।

মুচি বেড়ালকে ভালো করে দেখছে। সত্যিই তো বেড়ালের লেজকাটা। নিশ্চয়ই বুড়িমা কেটে দিয়েছে। আহারে। বেচারির কাটা লেজ থেকে রক্ত ঝরছে, কী বিপদ।

মুচির দয়ার শরীর। জুতো সেলাইয়ের কাজ থামিয়ে বলছে, বেড়ালমাসি বড্ড খিদে পেয়েছে আমার। আগে যাও দোকানে, দু-টুকরো রুটি এনে দাও দেখি। তবেই চাষিভাইজানের জন্য এক জোড়া নতুন জুতো তোমাকে দেব।

বেড়াল তখনই দৌড়েছে রুটির দোকানে। বেকারির মালিক এক মহিলা। ইনিয়ে বিনিয়ে বেড়াল বলছে, মাসি গো মাসি, একটা উপকার তো করো, দু-টুকরো রুটি আমার চাই। রুটি পেলে মুচি ভাইকে দেব। তার বড্ড খিদে পেয়েছে। রুটিপেলে সে আমাকে এক জোড়া নতুন জুতো দেবে। জুতো নিয়ে দেব চাষিভাইকে। সে জুতো পেলে পাতাওয়ালা গাছের সেবা করবে। গাছ খুশি হলে আমাকে পাতাওয়ালা একটা ডাল দেবে। ডাল নিয়ে দৌড়োব ভেড়ির কাছে। সে এখন মাঠে ঘাসপাতা খাচ্ছে। ভেড়ি তখন আমাকে এক বাটি দুধ দেবে বলেছে। দুধ নিয়ে দেব বুড়িমাকে। বুড়িমা বাড়িতে অপেক্ষা করছে। দুধ পেলে বুড়িমা আমার কাটা লেজ সেলাই করে দেবে।

বেকারি মাসি বেড়ালকে ভালো করে দেখছে। সত্যিই তো বেড়ালের লেজ কাটা। নিশ্চয়ই বুড়িমা কেটে দিয়েছে। আহারে। বেচারির কাটা লেজ থেকে রক্ত ঝরছে, কী বিপদ।

বেকারি-মাসির দয়ার শরীর। বলছে, কাজের লোক আসেনি আজ। তুমি আমার দোকানের ময়লাগুলো বাইরে ফেলে এসো। তাহলে তোমাকে দু-টুকরো রুটি দেব। দেরি করো না।

বেড়াল আর দৌড়তে পারছে না। হাঁটতেও পারছে না। শরীরও চলতে চায় না। তবু তাকে তো থেমে গেলে চলবে না।

তখনই কাজে লেগে গেছে। দোকানের ময়লা আবর্জনা বাইরে গিয়ে বারে বারে ফেলে এসেছে। দোকান সাফসুফ করেছে। বেকারি-মাসি খুশি হয়ে দু-টুকরো রুটি এনে দিয়েছে।

বেড়াল এবার দৌড়েছে মুচিভাইজানের কাছে। রুটি পেয়ে মুচিভাইতো বেজায় খুশি। নতুন জুতো জোড়া দিয়েছে বেড়ালমাসিকে।

বেড়াল তখনই দৌড়েছে চাষিভাইজানের কাছে। ঝকঝকে জুতো পেয়ে চাষির মুখে কী হাসি। সে এসেছে পাতাওয়ালা গাছের গোড়ায়। যত আগাছা ছিল সাফসুফ করে দিয়েছে। গাছের গোড়ার মাটি নেড়েচেড়ে নরম করেছে।

খুশি হয়ে গাছ বেড়ালকে পাতাওয়ালা একটা ডাল উপহার দিয়েছে। সে ডালের ওজন কম নয়। কষ্টেসৃষ্টে টেনে হিঁচড়ে তা নিয়ে গেছে ভেড়ির কাছে। ভেড়ি মাঠে ঘাসপাতা খাচ্ছিল। কচি কচি পাতাওয়ালা বড়ো সড়ো ডালটা পেয়ে ও তো বেজায় খুশি। সঙ্গে সঙ্গে কচি কচি পাতা খেতে শুরু করেছে। এক বাটি দুধ এনে দিয়েছে বেড়ালকে। অতি সাবধানে দুধ নিয়ে বেড়াল এসেছে বুড়িমার কাছে। কেঁদে

কেঁদে বুড়িমাকে বলছে: মিঁয়াও মিঁয়াও, এই দুধ নাও, মিঁয়াও মিঁয়াও লেজ জুড়ে দাও।

বুড়িমার দয়ার শরীর। দুধ পেয়ে বুড়ি তো অবাক। সুই সুতো হাতের কাছেই ছিল। তখনই বেড়ালের লেজ সেলাই করে দিয়েছে। বেড়াল নাচতে শুরু করেছে। নাচ যেন থামতেই চয় না। তোমরা যদি একবার দেখতে।

বুড়িমার সঙ্গে বেড়ালের আবার ভাবভালোবাসা হল। সেই থেকে বেড়াল চুরি করার বদ অভ্যাসটা ছেড়েছে। বেড়াল বেশ ভালো করেই বুঝেছে, চুরি করলে কেমন শাস্তি পেতে হয়।

ছড়া

রূপক চট্টরাজ

তা ধিনা ধিন ধিন
পঞ্চানন খায় থিন
বিস্কুট শেষ হল ও ভাই
তরুণ বাজায় টিন।
তা ধিনা ধিন ধিন।।

নির্ভাবনা

হাননান আহসান

মা আমার ধান্যবরণ
মা আমার কলকে ফুলের
মা আমার সজনে আঁটি
মা আমার এলো চুলের
মা আমার আকাশ মাটি
মা আমার সপ্তসাগর
মা আমার মৌন বিকেল
মা আমার একলা জাগার
মা আমার তালের পাখা
মা আমার শীতলপাটি
মা আমার দখিন বায়ু
মা আমার বাংলা খাঁটি
মা আমার কাব্যকলা
মা আমার ছন্দনীড়ের
মা আমার মূর্তিময়ী
মা আমার অযুত ভীড়ের
মা আমার খিড়কি দুয়ার
মা আমার নির্ভাবনা
মা আমার সব আয়োজন

চাই যে

অপূর্বকুমার কুণ্ডু

ছেলেটা একলা থাকে,
ধুলোতে কী সব আঁকে,
গাছ,ফুল,পাহাড়,নদী.....
কখনও একটা পাখি উড়ছে।
কাগজের চরকি হাতে,
খেয়ালের খেলায় মাতে,
দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে...
সে আবার একলা মাঠে ঘুরছে।
কখনও পুকুর পাড়ে,
ঝোপ ঝাড় বন বাদাড়ে,
কী যেন বেড়ায় খুঁজে....
দেখলেই ফড়িংটা সে ছুটছে।
সে আবার খেলার ফাঁকে,
মুখোশে মুখটা ঢাকে,
খুশিটা ছড়িয়ে দিয়ে...
একলাই ভয়ের মজা লুটছে।
দিন যেই ফুরিয়ে আসে,
কেউ তার নেই তো পাশে,
আকাশে দুচোখ তুলে...
বলে, চাঁদ তোমার আলো চাই যে।
এখনি ফিরবো ঘরে,
বলো না কেমন করে,
আমাদের ঘরটা জুড়ে...
আলো নেই, একটু আলো চাই যে।

ঘুড়ি

সৌমিত্র মজুমদার

ভোকাট্টা ঠিক হল যেই
অমনি ছোটা শুরু,
টপকায় ছাদ, এ গাছ ও গাছ
বুক যে দুরু দুরু ;
কী যে নেশা বলব কী আর
সিঁটকে যে যাই ভয়ে—
কেউ শোনে না একটি কথাও
দে ছুট বিশ্বজয়ে !
পেটকাট্টি এবং তিলক
মুখপোড়া-দের ভিড়ে,
শান্তি সকল বিঘ্নিত হয়
চিন্তা বাড়ে শিরে।

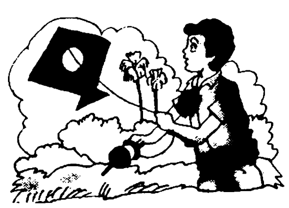

পালিত স্যারকে বিতানের প্রথম থেকেই খুব একটা ভালো লাগেনি। বড্ড পক্ষপাতিত্ব করেন। যেই না শুনলেন রূপম হেডস্যারের ছেলে অমনি তার দিকে বাড়তি নজর দিতে লাগলেন। রূপমের ওদের ক্রিকেট টিমে ঢোকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না কারণ সে ব্যাটিং বা বোলিং কোনটাই খুব ভালো করতে পারেনা আর ফিল্ডিংয়ের তো কথাই নেই, তাও সে টিমে জায়গা পেয়ে গেল আর ছাঁটাই হয়ে গেল বেচারা জয়। অথচ জয় দারুণ ভাল ফিল্ডিং করে, অনেকবার ক্যাচ ধরে ম্যাচও জিতিয়েছে। টিম থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে মন মরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, বিতানকে দেখে বলল, "দেবতোষ স্যার কত ভালো ছিলেন না ? কেন যে ওনাকে চলে যেতে হল।"

রূপম হেডস্যারের ছেলে বলে অনেক শিক্ষকই তাকে বাড়তি পাত্তা দেন। সেটা সবার গা সওয়া হয়ে গেছে কিন্তু ডিপি বয়েজ স্কুলের সঙ্গে ম্যাচটায় যা হল সেই রকমটা বিতান আগে কোনদিন দেখেনি। ডিপি বয়েজ স্কুল অতিথি হয়ে বিতানদের স্কুলে খেলতে এসেছিল। ক্লাস এইট, নাইন, টেনের ছেলেদের নিয়ে ওদের স্কুলের ক্রিকেট দলটা তৈরি হয়েছিলি। ইলেভেন টুয়েলভের পরীক্ষা চলছে বলে পড়ার চাপ বেশি তাই ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বিতান ভালো ব্যাটিং করে, ফিল্ডিংও তার বেশ ভালো তাই ইলেভেন টুয়েলভের ছেলেরা না খেললে টিমে ওর জায়গা বাঁধা। বিতানরা প্রথমে ব্যাট করে ভালোই রান তুলল কিন্তু ডিপি বয়েজের রুদ্রকে কিছুতেই আউট করা যাচ্ছিল না আর তখনই প্রলয় কাজটা করল। রুদ্র রান নিচ্ছে এমন সময় বল কুড়োতে যাওয়ার ভান করে প্রচণ্ড জোরে গিয়ে তাকে ধাক্কা মারল প্রলয়। সেই ধাক্কার চোটে রুদ্র পড়ে গেল। প্রলয় পড়ল তার ঘাড়ে আর সেই সুযোগেই তাকে অনায়াসেই রান আউট করে ফেলল শমীক। ডিপি বয়েজ স্কুলের সঙ্গে আসা টিচার ভদ্রলোক ঘটনাটাকে ইচ্ছাকৃত বলতে পালিত স্যার ভীষণ রেগে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। শেষমেশ ডিপি বয়েজরা সেদিন হেরেই বাড়ি ফিরল।

আলো ছায়ার খেলা

অনন্যা দাশ

পরদিন জয় এসে চুপিচুপি বিতানকে বলল, "প্রলয়ের নতুন জুতোটা দেখেছিস ?"
বিতান লক্ষ করে দেখল। সত্যিই তো ! প্রলয়ের পায়ে ঝকঝকে নতুন জুতো। কোথা থেকে পেল সে ? প্রলয়দের আর্থিক অবস্থা কোনদিনই খুব একটা ভালো ছিল না তার ওপর প্রায় বছরখানেক আগে আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটে ওদের পরিবারে। আসলে প্রলয়ের বাবা একটা ফ্যাকটরিতে কাজ করতেন। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্যেই হোক আর যে কারণেই হোক ওনার ডান হাতটা মেশিনে আটকে কেটে আলাদা হয়ে যায়। তারপর থেকেই ওনার চাকরি নেই। কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণও বিশেষ দেয়নি। প্রলয় পড়াশোনা আর খেলাধুলো দুটোতেই ভালো বলে স্কুলের সবার কথা শুনে প্রিন্সিপাল স্যার ওর আর ওর ভাইয়ের স্কুলের মাইনে মকুব করে দিয়েছেন। তাই প্রলয় আর ওর ভাই স্কুলে পড়তে আসে বটে কিন্তু ওদের সংসারে বেশ অভাব। ওর মা ছোটখাট কী একটা কাজ করেন তাই দিয়েই ওদের সংসার চলে। দামি জুতো কেনার পয়সা ওর মোটেই নেই। প্রলয়কে জিজ্ঞেস করতে সে অবশ্য বলল ওর মামা এসেছিলেন মুম্বাই থেকে তিনিই কিনে দেয়েছেন।

এদিকে কেকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে ওদের ম্যাচের তারিখ এগেয়ে আসছে। বিতানরা জোর কদমে প্র্যাকটিস করছে। কেকে বিদ্যালয় ওদের স্কুলের চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী। ফুটবলের কাপটা এবার বিতানদের স্কুল পেয়েছে কিন্তু গত দু'বছর ধরে ক্রিকেটের কাপটা কেকেই নিয়ে গেছে। বিতানরা চায় এবার ওটাকে ফিরিয়ে আনতে। সামনে পরীক্ষা তাই বারো ক্লাসের দাদারা খেলতে পারবে না এবার। ইলেভেনে ভালো খেলোয়াড় বলতে একজনই তাই বিতান ব্যাটসম্যান হিসেবে চান্স পাবে সেটাই আশা করছে সবাই। জয় যথারীতি রূপমের জন্যে টুয়েলভথ ম্যান হয়ে বসে থাকবে।

ম্যাচের দিন চারেক আগে খবরটা জয়ই আনল। জয়ের প্রতিবেশী তন্ময়ের সঙ্গে প্রলয়ের ভাই নিলয়ের খুব ভাব। তন্ময়ই কথাটা জানতে পেরে জয়কে বলেছে।
"জানিস, রুদ্রকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে ম্যাচটা জেতাবার জন্যে পালিত স্যার প্রলয়কে নতুন জুতো কিনে দিয়েছেন। ওই সব মামা টামা বাজে কথা। কেকে বিদ্যালয়কে হারাতে পারলে নতুন এক সেট জামা-প্যান্ট কিনে দেবেন বলেছেন। ওই ম্যাচটা নাকি আমাদের স্কুলকে জিততেই হবে। প্রিন্সিপাল স্যার পালিত স্যারের ওপর চাপ দিচ্ছেন বিস্তর। প্রলয়দা নাকি কথা দিয়েছে যে ও সব রকম চেষ্টাই করবে। বেচারা নিলয় বড্ড ভালো মানুষ। ওর ওই চিটিং ব্যাপারটা একদম ভালো লাগছে না তাই কথাটা চেপে রাখতে না পেরে তন্ময়কে বলে ফেলেছে। এদিকে তন্ময় তো আমাদের নীচের তলাতেই থাকে। সেদিন রাইদির বিয়েতে আমাকে তো সব বলে দিল সে। "

"কিন্তু ব্যাপারটা তো খুব গুরুতর। কী করা যায় ? প্রিন্সিপাল স্যারকে বলব ?"

"কোন লাভ হবে না। প্রলয়দা আর পালিত স্যার দুজনেই বলবে ওটা মিথ্যে কথা। আমাকে উনি টিম থেকে বার করে দিয়েছেন বলে আমার স্যারের ওপর রাগ আছে সেটা সবাই জানে। ওরা বলবে ওদের বদনাম করার জন্যে আমি মিথ্যে কথা রটাচ্ছি। তাছাড়া আমি কথা দিয়েছি যে তন্ময় আর নিলয়কে এই সবের মধ্যে জড়াবো না।"

"হুঁ, তাহলে উপায় ?"

"অন্য কোন রাস্তা বার করতে হবে...

"একটা কাজ করলে হয় না ?"

"কী কাজ ?"

"প্রলয়দার যে জিনিসটা খুব দরকার সেটা আমি জানি। আমরা ওকে বলব যে ও যদি পালিত স্যারের কথা না শোনে আর কোন রকম চিটিং না করে তাহলে আমরা ওকে একটা সাইকেল কিনে দেবো তাহলে কেমন হয় ? খেলার ফল যাই হোক না কেন সাইকেল ও পাবে।"

"কিন্তু তুই কোথা থেকে সাইকেল কেনার পয়সা পাবি শুনি ?"

"না, না, আমার কাছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা আছে। দিদা মিষ্টি খাবার জন্যে দিয়েছিলেন। সেটা দিয়ে তো কিছুই হবে না। আমি ভাবছিলাম চাঁদা তোলার কথা।"

"চাঁদা তুলবি ? কী বলে ?"

"বেশি না সবার কাছে এক-দু টাকা করে চাইব। সেটা সবাই দিয়ে দেবে। বলব প্রলয়ের অসুখ করেছে ওর চিকিৎসার জন্যে। "

"তা বলতে পারিস খুব একটা মিথ্যে বলাও হবে না। বেচারা মানসিক ভাবে অসুস্থ তো হয়েই পড়েছে পালিত স্যারের চাপে পড়ে।"

"হ্যাঁ, যা বলেছিস। তবে অন্যদের বলব প্রলয়কে কিছু না বলতে তাহলে বেচারা দুঃখ পাবে।"

ব্যাস যেমন ভাবা তেমনি কাজ। বিতান আর জয় প্রথমে নিজেদের ক্লাসের তারপর স্কুলের সবার কাছ থেকে একট দু টাকা করে চাঁদা চাইতে শুরু করে দিল। প্ল্যানটা ঠিক ঠাক এগুচ্ছে এবং সাইকেলের জন্যে টাকা প্রায় জোগাড় হয়ে গেছে দেখে ম্যাচের দুদিন আগে প্রলয়কে কথাটা বলল বিতান, "প্রলয়দা, তুমি আমাদের টিমের সেরা বোলার আর তুমি খাটছো সব চেয়ে বেশি। আমাদের সবার সাইকেল আছে অথচ তোমার নেই। তোমাকে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাতায়াত করতে হয় তাই আমরা ঠিক করেছি তোমাকে স্কুলের তরফ থেকে একটা সাইকেল কিনে দেওয়া হবে। কেকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলার আগেই দেওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ঠিক হয়ে উঠল না। পরের সপ্তাহে সাইকেল তুমি পাবেই। আমরা একটা দারুণ দেখতে সাইকেল পছন্দ করে রেখেছি তোমার জন্যে। তুমি খালি কথা দাও যে ডিপি বয়েজের সঙ্গে খেলার সময় যা হয়েছিল তা আর হবে না।"

প্রলয়ের দুচোখে অবিশ্বাস, যেন ঠিক শুনেছে কিনা

বুঝতে পারছে না। এ যে মেঘ না চাইতেই জল।

বিতান আরো বলল, "আমরা জিতি বা হারি সাইকেল তুমি পাবেই। তবে কী এবারের খেলাটায় কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যাকাডেমি থেকে লোক আসছে আম্পায়ারিং করতে। কোন রকম গন্ডগোল দেখলে কিন্তু আমাদের টিমকে ডিসকোয়ালিফাই করে দেবে...." শেষ অস্ত্রটা ছেড়ে দিয়ে বিতান সরে পড়ল।

কেকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলায় বিতানদের টিম প্রথমে ব্যাটিং করে ভালোই রান তুলল কিন্তু ডিপি বয়েজের রুদ্রর মতন কেকের রাজদীপ একেবারে মারমুখী হয়ে প্রবল পেটাতে শুরু করল। মন্দের ভাল যেটা হল রূপম ফিল্ডিং করতে গিয়ে পায়ে চোট পেয়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরে এল আর জয় তার জায়গায় খেলার সুযোগ পেল। দারুণ ফিল্ডিং করে ও একটা রান আউটও করল কিন্তু সেটা রাজদীপ নয়, অন্য দিকের পার্থ। রাজদীপ মোটামুটি কোন রকম চান্স না দিয়েই খেলে চলল। পালিত স্যার কয়েকবার প্রলয়, প্রলয় বলে ডাকলেন কিন্তু প্রলয় ওনার কথা শুনেও না শোনার ভান করল। যখন শেষের ওভারে পাঁচ রান দরকার তখন স্যার ক্লাস এইটের সৌগতকে দিয়ে জলের বোতল আর চিরকুট পাঠালেন প্রলয়ের জন্যে। ওদের ন'টা উইকেট পড়ে গেছে আর একটা হলেই খেলা শেষ হয়ে যায় কিন্তু প্রলয় পালিত স্যারের কোন কথা শুনল না। কোন রকম খারাপ কাজ করতে রাজি নয় আজ সে। সে শুধু প্রাণ ঢেলে ভালো বোলিং করে গেল নিজের মতন। শেষের আগের বলে একটা চার মারল রাজদীপ - দুই টিমের রান সমান সমান হয়ে গেল। তবে প্রলয়ের লাস্ট ইয়র্কারটাকে কিছুই করতে পারল না রাজদীপ, ফলে খেলাটা টাই হয়ে গেল। প্রিন্সিপাল স্যার ঘোষণা করলেন যে ট্রফিটার জন্যে এক মাস পরে আবার ম্যাচ খেলা হবে কিন্তু বিতানদের আনন্দ দেখে কে। ওরা যেন ম্যাচ জিতে গেছে সেই রকম ভাবে প্রলয়কে কাঁধে তুলে উল্লাস করল। কেকে বিদ্যালয়কে হারাতে না পারাতে দুঃখ নেই পালিত স্যারকে তো হারিয়ে দিয়েছে ওরা।

প্রলয় এখন ঝকঝকে নতুন সাইকেল করে স্কুলে আসে। কেকে বিদ্যালয়ের খেলাটার কয়েক দিন পর থেকেই আর পালিত স্যারকে ওদের স্কুলে দেখা যায়নি। আসলে নিজের কাজে লজ্জিত হয়ে প্রলয় প্রিন্সিপালকে সব কথা খুলে বলে দিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে প্রিন্সিপাল স্যার ওকে আর কিছু বলেননি কারণ ওর দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে ওকে দিয়ে বাজে কাজ করানো হচ্ছিল তাতে ওর দোষ ততটা নেই। বিতান আর জয় ভয় পাচ্ছিল যে চাঁদা তুলে সাইকেল কেনার খবরটা জেনে উনি হয়তো ওদের খুব বকবেন কিন্তু উনি কিছু বললেন না ওদের। বরং স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে ফেয়ার প্লের জন্যে একটা বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হল। সেটা প্রিন্সিপাল স্যার নিজেই বিতান আর জয়ের হাতে তুলে দিলেন।

পারাপার

শীতল চট্টোপাধ্যায়

পাখিদের ডানা আর মেঘে নেই পার
পার জোড়া বৃষ্টি দু'পারে সবার।

ওপার-ওপার হতে থামা নেই ঝড়ে
এপারের পাতা উড়ে ওপারেতে পড়ে।

এপারের ধুলো মাখে ওপারের মাটি গা
পারাপার না মেনেই ঋতুদের হাঁটা পা।

পার সিমা না চিনেই ভেসে যায় কাটাঘুড়ি
পারকে মুছেই গাছে এক সাথে ধরে কুঁড়ি।

দুটো পারে একটাই দিন-রাত থাকে জুড়ে
বাড়া ডাল, বুনোলতা এগিয়ে পারকে ফুঁড়ে।

এপারের গরুগু লো ওপারের ঘাস টানে,
পার ভোলা ঘাসেরা মেলানো সবুজ প্রাণে।

এল পুজো

মহসীন মল্লিক

এই তো কদিন অভ্র ছিল মেঘ ফুলেতে ঢাকা
মেঘের কোলে বন্দি ছিলেন সূর্যিমামা একা।
যখন-তখন বৃষ্টি মুখর গড়িয়ে যেত চাকা
হঠাৎ আবার রবির হাসি তবু পেতাম দেখা।

কালো আকাশ তার মধ্যেই এখন শুভ্র হাসি
টুকরো মেঘের নৌকা ভাসে নীল গগনের পারে
মুক্ত সূর্য ছড়ায় আলো, টগর বাজায় বাঁশি
সে সুর শুনে কাশের গুচ্ছ মুগ্ধ মাথা নাড়ে।

সন্ধ্যেবেলা শিশির ঝরে শিউলি করে স্নান
স্নিগ্ধ সবুজ পাতায় খেলে নরম চাঁদের আলো
মিষ্টি সুবাস চতুর্দিকে মন করে আনচান
এল পুজো বছর পরে সবাই থেকো ভালো।

মিলি ও রতনকাকু

সমাজ বসু

এ বাড়িতে লোকজন বলতে মা, বাবা আর মিলি। মিলি, পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। মিলির মা বাবা দু'জনেই অফিসে চাকরি করে। সারাদিন মিলি তার রতনকাকুর কাছেই থাকে। রতন কাজের লোক। সংসারে বাজারহাট, রান্নাবান্না থেকে মিলির দেখাশোনা সবই সে সামলায়। মিলির মা বাবা দু'জনেই খুব নিশ্চিন্ত। রতন একা হাতে সবকিছু সুন্দরভাবে করতে পারে। মিলিও রতনকাকুর কাছে বেশ আনন্দেই থাকে। রতনকাকুর সাথে কত গল্প করে, ছবি এঁকে দেখায়, রাইমস শোনায়। এই কদিনে সে যেন মিলির বন্ধু হয়ে উঠেছে।

রতনকে পুরোমাত্রায় বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। তাই মিলির মা বাবা চোখ বুজে রতনের ওপর ভরসা করে। কিন্তু রতনের ভেতর যে বাস করে আর এক রতন। সে কথা ঘুণাক্ষরেও টের পায়না মিলির মা বাবা কেউ। বাজার ফেরত টাকা পয়সা থেকে শুরু করে ঘরের টুকিটাকি জিনিস, এমনকি মিলির দু'একটা খেলনাও রতন হারিয়ে রাখে। এই তো সেদিন, মিলির কানের একটা সোনার দুল পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোথাও না পেয়ে রতনই সাফাই গাইল- হয়তো চান করার সময় মিলির কান থেকে খুলে পড়ে গেছে তারপর বাথরুমের নর্দমায় গলে যাওয়াতে মিলি বুঝতেও পারেনি।

হ্যাঁ এটাতো হতেই পারে। মিলির মা বাবা দুজনেই রতনের কথায় সায় দিল।

রতন ভালো করেই জানে, এ বাড়িতে সবকিছু চোখে চোখে রাখার মত লোক কেউই নেই। মিলির মা বাবা সারাদিন অফিসের কাজে ব্যস্থ থাকে। তাদের কাছে মেয়ের সারাক্ষণের পরিচর্যাই অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। রতন সে কাজটা ভারী সুন্দরভাবে পালনও করে। তাই রতনের বদ অভ্যাসগুলো তাদের চোখেই পড়ে না।

সেদিন দুপুরে ভাত খাওয়ার পর, রতন একটু শুতে যাবে, এমন সময় মিলি তার ঘরে ঢুকে রতনকে ডেকে তোলে।

– রতনকাকু ! রতনকাকু ! মিলির ডাকে রতন উঠে বসে পড়ে।

– তুমি ঘুমোওনি মিলি। না ঘুমোলে সন্ধ্যেবেলা পড়তে পারবে না যে। তখন মা যে বকবে।

– না, আজ আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া কাল তো রোববার। মা বাবার ছুটি। আজকের পড়াটা কাল করে নেব। মিলির মথায় রতন হাসতে থাকে।

– আচ্ছা বল, তুমি কী বলতে এসেছিলে ?

– রতনকাকু, আমি না আজ স্কুল টিচারের কাছে খুব সুন্দর একটা গল্প শুনে এসেছি। তুমি গল্পটা শুনবে ?

– হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনবো। বল। রতন আগ্রহের সুরে বলল।

– অনেকদিন আগে রত্নাকর নামে একটা ভয়ংকর ডাকাত ছিল। সে জঙ্গলের মধ্যে সারাদিন ঘুরে বেড়াত আর সেই পথ দিয়ে যারা যেত, তাদের টাকাপয়সা, সোনাদানা সবকিছু

কেড়ে নিত। এইভাবে ডাকাতি করেই তার দিন কাটছিল। বাড়ির লোকজন তাকে কিছুই বলত না। সবাই তাকে খুব বিশ্বাস করত।

– তারপর কী হল ? মিলিকে থামিয়ে রতন বড় বড় চোখ করে জানতে চাইল।

– তারপর সেই পথ দিয়ে এক সাধুবাবা যাচ্ছিল। রত্নাকর ডাকাত সেই সাধুবাবার পথ আগলে দাঁড়াতেই সাধুবাবা বলল – তুমি ডাকাতি ছেড়ে দাও। তোমার এই পাপের ভাগ কেউ নেবে না। তোমাকেই সারাজীবন এই পাপের বোঝা বইতে হবে। তুমি মরেও শান্তি পাবে না। এই বলে সাধুবাবা সেখান থেকে চলে গেল।

– তারপর সেই ডাকাতটা কী করল ?

– দাঁড়াও একটু মনে করে বলছি। এই ব'লে মিলি গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে থাকে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সাধুবাবু চলে যেতেই রত্নাকরের কী মনে হল, সেইদিনই সে ডাকাতি ছেড়ে দিল। শুধু চোখ বুজে ভগবানের ধ্যান করতে লাগল। এইভাবে দিনের পর দিন ধ্যান করতে করতে রত্নাকরের চারপাশে উইপোকার বাড়ি তৈরি হল। তবু রত্নাকারের ধ্যান ভাঙেনি। অবশেষে সেই দস্যু রত্নাকরকে সবাই বাল্মিকী মুনি নামে ডাকতে শুরু করল। গল্পটা কেমন রতনকাকু ? মিলি জিজ্ঞাসা করে।

– সত্যি, এত ভাল গল্প আমি আগে কখনো শুনিনি, মিলি। এবার যাও ঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়ো। আমিও ঘুমোই। এই বলে, রতন মিলিকে হাত ধ'রে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

আজ রোববার। বাড়ির সকলে এই একটা দিন বেলায় ওঠে। সাড়ে আটটায় ঘুম থেকে উঠেই মিলির মা, সদর দরজার তালা খোলা দেখে চমকে ওঠে। তাহলে কী রতন কাল রাতে দরজায় তালা দিতে ভুলে গেছে ? ততক্ষণে মিলির বাবাও ঘুম থেকে উঠে ঘটনাটা জনার পর রতনকে খুঁজতে থাকে। বাড়ির কাউকে না জানিয়ে এইভাবে চলে যাওয়ার লোক তো রতন নয়। কিন্তু রতনের ঘরে ঢুকে মিলির মা বাবা দুজনেই অবাক। ঘরের কোণে শুধু একটা কাপড়ের ব্যাগ পড়ে আছে। রতনের জামা, প্যান্ট, চটি কিছুই নেই। তারা কাপড়ের ব্যাগ থেকে একে একে ঘরের কিছু টুকিটাকি জিনিস, মিলির বাবার একটা ভাল জামা, কিছু টাকা পয়সা এমনকি মিলির হারিয়ে যাওয়া সোনার দুলটা আবিষ্কার করতেই দু'জনে বিস্ময়ে হতবাক। রতনের এই রূপ দেখার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না তারা। পরমুহূর্তেই তারা বুঝতে পারল গতকাল মিলির মুখে দস্যু রত্নাকরের গল্প শোনার পর রতন তার চৌর্যবৃত্তির অবসান ঘটিয়ে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে গেছে। মিলির রতনকাকুর এই নবজন্মের কথা ছোট্ট মিলি জানতেও পারল না। রতনের এই পরিবর্তনে মিলির মা বাবা দুজনেই মনে মনে রতনের সুন্দর জীবনের কামনা করতে লাগল।

ছবির মতন একই বয়স যেন !

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

"দুগ্গা যদি তোমার মা হন, আমায় তবে দিদা
বলতে কেন নিষেধ করো ? কোথায় সে অসুবিধা !—
মাকে গিয়ে বললো হঠাৎ পুচ্‌কে মেয়ে টুকি :
"এই দুনিয়ার সব মানুষেই থাকুক সদাই সুখী।"

মা বললেন "না রে খুকি, উনিই সবার মাতা ;
সবার কষ্টে দাঁড়ান পাশে, উনিই অন্নদাতা।"

"তাহলে ওই মানুষগুলো কাঁদছে কেন ঘরে
একটা কাপড়, দু'মাঠো ভাত, একটু সুখের তরে ?"

মা বললেন : "তা জানি না। সবাই মা-ই বলে।
এই বয়সে অমন পাকা তোর হলে কি চলে ?"

বললো খুকু "দেখো গো মা, তোমার বয়স বাড়ে ;
আমারও। তা দিদার বেলায় কে গোপনে কাড়ে !"

মা বললেন : "দেবী উনি। অমন বলিস কেন ?"

বললো খুকু "ছবির মতন একই বয়স যেন !"
ওই দেখো মা দিদির ছবি দেয়াল ধরে ঝোলে,
তখন তো তার বয়স তিনেক, তোমার স্নেহের কোলে।
এখন দিদি উনিশ বছর, আমি বছর বারো।
তোমার মা-ও বুড়ো হলেন। বয়স বাড়ে তারও।
তবু কেন আমায় তুমি বলতে বলো 'মা' ? সে
মাটির ছবি, এক বয়সের। কাশের হাওয়ায় ভাসে...
এবার যখন দেখা পাবো বলবো ও-শিব দাদু,
এলেই যখন দাও দেখিয়ে তোমার একটা যাদু।
এক মন্ত্রেই দাও পালটে দুখীর জীবন ; সবে
আনন্দেতে কাটাক জীবন মর্তে, তোমার ভবে।
যদি পারো, তবেই এসো দুগ্গা দিদায় নিয়ে।
তা না হলে আর এসো না। যাও তো কষ্ট দিয়ে।"

ভূতের গপ্পো
বাবিন

রাত-বিরেতে ডাক দিলে কেউ, সাবধান খুব জেনো,
এমনি করেই আসে নিশি, এই কথাটি মেনো।

বাঁশ যদি এক পথের ওপর থাকতে পড়ে দ্যাখো,
খুব সাবধান, তার ওপরে পা'টি ফেলো নাকো।

সন্ধ্যেবেলায় বেলতলাটি এড়িয়ে যেও চলে,
ব্রহ্মদত্যি চান করতে যাবেন, গেছেন বলে।

রেললাইনের ধারে কাছে যেওনা খবরদার,
সন্ধ্যে হলেই স্কন্ধকাটা মিলবে বারংবার।

পুকুর-ডোবা-নদীর জলে দেখলে আলোর ভেলা,
জানবে ওটা ভূতের মেয়ে – আলেয়ার খেলা।

গপ্পো এমন পাবে নাকো স্কুল-কলেজের বইতে
ভালবেসে ঠাম্মা এসব অন্ধকারে কইতে।

নাকের কামান দেগে
মলয়কুমার হালদার

রাতের বেলায় শুলাম সেদিন নিয়ম সব-ই মেনে
ভাতটি খেয়ে মুখটি ধুয়ে লেপটি গায়ে টেনে।
পাশের ঘরে শুয়ে কাকার ঘুমটি হল পাকা
তালে তালে মৃদুস্বরে শুরু হল নাকডাকা।
গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম মুখটি ঢেকে লেপে
নাসিকার মূর্চ্ছনাতে ঘুমটি এলো চেপে।
গভীর রাতে ক'টার সময় ? খেয়াল তো আর নাই
ঘুমটি হঠাৎ ভেঙ্গে গেল ভীষণ শব্দে ভাই।
বোনটি আমায় জড়িয়ে ধরে বলল ভয়ে ভয়ে
শুনছো দাদা ? সৃষ্টিটা আজ যাচ্ছে ঠিকই লয়ে।
কাকা হঠাৎ পাশটি ফেরেন করে ভীষণ শব্দ
ওমা একি ? সাথে সাথেই সব শব্দই জব্দ।
কাকা আমার উগ্রপন্থী বৃথাই উঠি রেগে
আইন ভাঙেন মাঝরাতেতে নাকের কামান দেগে।

গাঁয়ের ছবি
দুর্গাচরণ ঘোষ

নদীর ধারে বাঁশের বাগান, নানান গাছের সারি
একটু দূরেই নতুন পুকুর পাশেই আমার বাড়ি।
ছবির মতো রাস্তাগুলো রাঙা ধুলো মাখা,
সারাটা দিন গাছগাছালির শান্ত ছায়ায় ঢাকা।
পথের পাশে মাটির বাড়ি খড় বা টালির ছাওয়া
ধান গম চাল সরষে তিলে ভর্তি ঘরের দাওয়া।
খেজুর পাতায় কিচির মিচির বাবুই বাসা নাচে
কোয়েল-শ্যামা শিস্ দিয়ে যায় তাল-তমালের গাছে।
টইটম্বুর পুকুরতলির কাজল কালো জলে
সকাল সাঁঝে জলপাখিরা আসে দলে দলে।
এদিক ওদিক চারিদিকেই খেতের সবুজ বোনা
মেঠো পথে হাসি মুখে চাষির আনাগোনা।
পাকা সড়ক ডাইনে রেখে রাখবে নদী বাঁয়ে
আঁকা বাঁকা পথ পেরিয়ে এসো আমার গাঁয়ে।

আমার চেষ্টা
বনশ্রী মিত্র

পূজা মানে জামা জুতো শুধু তা তো নয়,
আছে জেনো গলা সাধা মান যেন রয়।
গানে আর কবিতায় দিয়েছি যে নাম –
নজরুল-কবিগুরু লহ হে প্রণাম।
দাদা আছে নাটকেতে কাকু তবলায়,
দাদু বলে ঘুম গেছে কান পাতা দায়।
মারামারি, কাড়াকাড়ি লেগে গেছে হায়,
পুজোবার্ষিকীগুলো আগে কে গো পায়।
ভুলোমনা আছি আমি তাই পাই ভয়,
কবিতাটা ভুলে গিয়ে না জানি কি হয়।
মনে মনে লাইনগুলো শুধু আওড়াই,
যাই হোক, চেষ্টাটা করে যাওয়া চাই।

সাক্ষাৎকার
দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

“আলনা ও আলমারি ধুতি ও কাপড়
কাঁথা-মাটি-ছাতা-বাটি- হাতা ও হাপর
উত্তুরে হাওয়া, ছুরি, ফরাসি আতর,
গোঁফদাড়ি, ঘরবাড়ি কাঠ ও পাথর
যাই পাই তাই খাই বড় ভালো ছেলে
আমগাছ, তিমিমাছ, যদি হাটে মেলে
কেটে বেটে ধুয়ে মুছে নুনজলে গুলে
শুখো চচ্চড়ি রাঁধি তেলে ভেজে তুলে।”

“আহা আহা বেশ বেশ থ্যাংকিউ ভাই
ইন্টারভিউ শেষ। আজ তবে যাই ?”

“আরে আরে কোথা যাও, দাঁড়াও খানিক
একটুকু বসে যাও লক্ষী মাণিক।
ধরে গেছে আঁচ আর চেপেছে কড়াই
কেটেকুটে ধুয়েমুছে রান্না চড়াই।”

“আরে না না, থ্যাংকিউ আজ মাপ দিন
এসে বসে খেয়ে যাবো আর এক দিন
তাড়া আছে আজ যাবো আরো এক বাড়ি —”

“বলো কী হে ? এইভাবে ছেড়ে দিতে পারি ?”
নাহে দাদা, যাওয়াটাওয়া হবে নাতো আর
আজ রাতে খাবো রেঁধে ঘন্ট তোমার
চেটেচুটে চেখেচুষে চিবিয়ে ও গিলে
গোটাগুটি খেয়ে নেবো পাঁচ ভাই মিলে।

ভোম্বল কম বল
জগদীশচন্দ্র সরখেল

বৃষ্টিতে ভিজে পুকুরের জল
ভোম্বল তাই আনে কম্বল
হায় হায় সেটা গেল জল-তল
ভোম্বল কাঁদে, তার কম বল।

সুরের সঙ্গী
উৎপলকুমার ধারা

বাউল তোমার বুকের ভেতর সুরের সমুদ্দুর
কান পেতেছি আসছো কবে শুনবো তোমার সুর
ইচ্ছেখাতার চিত্র এঁকে মস্ত আকাশপাড়ায়
উড়াল খুশির সুর খুঁজে পাও গান বাঁধো একতারায় !

তোমার গানের সুরেই জানি বৃষ্টি ঝরায় মেঘ
সরল নদীর দূর হয়ে যায় সমস্ত উদ্বেগ
হিংস্র ঝড় শান্ত যে হয় তোমার গানের সুরে
আঁধার ঘেরা ভয়ভরা রাত ঠিক চলে যায় দূরে !

যে সুর জানি ঘুচিয়ে দিয়ে সকল অন্ধকার
বদ্ধথাকা অবুঝ মনের দেয় খুলে সব দ্বার
তোমার সুরের ছন্দে আঁকা স্বপ্ন শত শত
এই মাটি এই ধুলোর উপর কৃষ্টি ঝরায় কতো !

নদীর বাঁধে মনমরা ঘাস শুকনো বালুর চর
তোমার সুরের উপর তারা সকলে নির্ভর
এই তো আমি হাত বাড়ালাম যাচ্ছো কোথায় চলে
বুক পেতেছি তোমার সুরের সঙ্গী হবো বলে !!

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় ছোটদের
পত্রিকা
টুকলু
সম্পাদকঃ অমল ত্রিবেদী

রূপকথাপুরে এখন টাপুর টুপুর বৃষ্টি দুপুর।

সকালেও গনগনে রোদের চনমনে আলো ছড়ানো ছিল রাজনগর জুড়ে। আকাশে অবশ্য কালো খন্ড মেঘের ভেলারা ছিল কিন্তু তারা তো বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনের আনন্দে। ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ার কোনও চিহ্ন মাত্র ছিল না।

রূপকথাপুরে বর্ষা আসে নিয়ম মেনে। ঠিক বর্ষাকালে। সকালের আকাশে কালো মেঘের ভেলা দেখে রাজমাতা বাতের ব্যথা ভুলে নেচে উঠেছিলেন আনন্দে। রানি বলেছিলেন, আসছে। রাজা তাড়াতাড়ি ছুটেছিলেন দরবারে। মন্ত্রী আমলাদের নিয়ে ডেকেছিলেন জরুরি সভা। বর্ষণ আসছে। সাজো। সাজাও। প্রস্তুত হয়ে নাও। বাঁধগুলো সব ঠিকঠাক আছে তো ? পরিস্কার আছে তো নর্দমা ? রাজপথ, এমনকি ছোট ছোট গলিপথের বাতিগুলো জ্বলছে তো ? গাছের বেয়াড়া ডালগুলো যেন ভেঙে না পড়ে। ছাঁটতে হবে। প্রজাদের চালে খড় আছে তো ? রাখালের মাথায় ছাতা ?

মন্ত্রী মশাই শান্ত করেছিলেন রাজাকে - কোনও চিন্তা করবেনা না মহারাজ। আকাশে এখনও আগুন রোদ। বাতাসে হাপরের হলকা। বর্ষা আসতে এখনও কম সে কম এক পক্ষ দেরি।

মন্ত্রীমশাইকে সমর্থন করে হাত তুলেছিলেন পণ্ডিত মশাই – মহারাজ, হিসেব মতো বর্ষা নামতে দেড় পক্ষকাল দেরি। তবে হ্যাঁ, বর্ষাবরণ উৎসবের দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলা যেতে পারে।

রূপকথাপুরে বর্ষাবরণ উৎসব যে কোনও উৎসবের জাঁক ছাপিয়ে যায়। রাজনগরের মাঠে বিশাল ম্যারাপের নীচে আসর বসে। যাত্রা কবিগান বাউলের আসর। প্রজাদের মাঝখানে রাজা বসেন রানি রাজমাতা আর রাজকুমারীকে পাশে নিয়ে। সারাদিন, সারারাত আসর চলে। রাজার ভান্ডার থেকে বিলি করা হয় মন্ডা মিঠাই। ছাতা। কাপড় জামা। ছোটদের দেওয়া হয় খেলনা পুতুল আর কাঠের হাতি ঘোড়া। বারোজন পুরোহিত মন্ত্র পড়েন আর দেড় মন ঘি জ্বালিয়ে যজ্ঞ করেন। বন বন ঘোরে রফিক কাকার নাগরদোলা। তালপাতার ভেঁপু আর তালপাতার সেপাই বিলি করে নন্দ দাদু। কালু ঢাকীর দল ঢোল বাজায় ডুমাডুম। ঢাক বাজে গুড় গুড়। কাই না না কাঁসরের সঙ্গে সুর ঢালে সানাইয়ের পোঁ।

রূপকথার রানি

তপনকুমার দাস

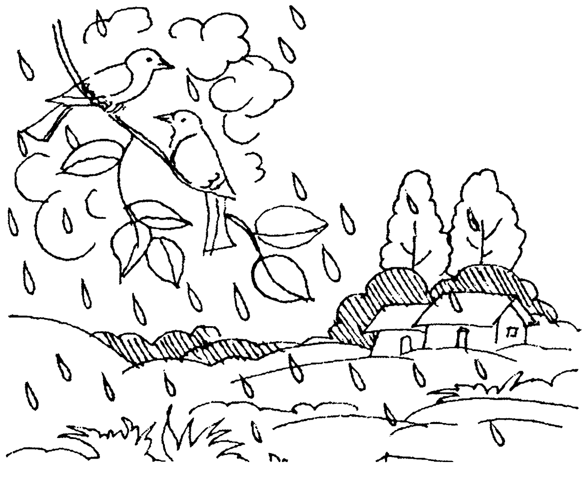

রাজকুমারী কিন্তু বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। সখীদের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে ছুটে যায় ফুলের বাগানে। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে ফুলের মতো সব বান্ধবীদের সঙ্গে মিশে নাচ করে। গান গায়। প্রজাপতিদের পিছনে ছুটে যায়। রাজার প্রহরীরা দূর থেকে নজর রাখে। সাধ্যি হয় না রাজকুমারীর কাছে যাওয়ার।

উৎসব যেই তিনদিনের বিকেলে পা দেয় অমনি আকাশ কালো হয়ে যায়। থমকে দাঁড়ায় বাতাস। পাখির ঝাঁক ডানা মেলে দেয় আকাশে। কালো কালো মেঘেরা দল বেঁধে জড়ো হয় রাজনগরের খোলা আকাশে। বিদ্যুৎ চমকায়। হাত তালিতে মুখরিত হয় উৎসবের মাঠ। রাজমাতা আকাশে উড়িয়ে দেন ফানুষ। আসছে। বর্ষারানি আসছে। আতসবাজিতে আগুন দেন রাজা। বায়না করেন দুষ্টু শিশুর মতো - কই, বৃষ্টি নামছে না তো। রংমশাল জ্বালিয়ে অধৈর্য হন রানি - এতো দেরি করছে কেন ? প্রজারা ছড়া কাটে -

আয় আয় বিষ্টি
খেতে দেবো মিষ্টি
পায়ে সোনার মল
মেঘ নাচলে জল।

ব্যস, অমনি শুরু হয় টাপুর টুপুর। ম্যারাপ ছেড়ে রাজা নামেন খোলা মাঠে। সঙ্গে রাজমাতা, রানি। ফুলের বাগান থেকে ছুটে আসে রাজকুমারী। আর আসে প্রজাপতির দল। দু'হাতে বৃষ্টির টাপুর টুপুর ছুঁয়ে দেয় রাজকুমারী। আর ঠিক তখনই শুরু হয় ঝমর ঝম। চুবড়ি ভেজা শেষ হলে রাজমাতা আর রাজকুমারী উঠে বসেন পালকিতে। ঘোড়ার পিঠে রাজা আর রানি। এবার প্রজাদের পালা। তাদের প্রাণভরে ভেজা শেষ হলে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করে মন্ত্রী ফিরে যান দরবারে।

মহারাজ, পনর তারিখ দিনটা ভারি শুভ —পাঁজির বুকে মুখ রেখে জানিয়ে দেন রাজপন্ডিত।

কিন্তু রাজার কানে কথা ঢোকে না। ঢুকবে কী করে ? রাজা তো গতবছরের বর্ষাবরণ উৎসব দেখছিলেন মনের আরশিতে। দেখছিলেন আর ভাবছিলেন। সেনাপতি সহ বাইশ জন প্রজার জ্বর হয়েছিল জলে ভিজে। গাছের ডাল ভেঙে পড়ে রাজপথ বন্ধ ছিল আড়াই দিন। বৃষ্টির তালে পা মেলাতে গিয়ে মচকে গেছিলো রাজকুমারীর গোড়ালি।

এবছর কিন্তু অনেক, অনেক বেশি সাবধান হতে হবে মন্ত্রী - আনমনে বলে দেন রাজা। হাতের ইশারায় পর্দা সরাতে বলেন প্রহরীকে। না, বন্ধ হয়নি বৃষ্টির টাপুর তাল।

মহারাজ পনর তারিখটা বেশ শুভ— নিজের অবস্থান থেকে একচুলও সরেনা না পণ্ডিতমশাই।

কেন ? কেন ? জানতে চান রাজা।

ওদিন আমাদের রূপকথার জন্মদিন - গদ গদ হন মন্ত্রীমশাই।

তাই তো। মনে পড়ে রাজার। রাজকুমারী রূপকথা এ বছর পনর তারিখে সাত বছর বয়স পার করে আটে পড়বে। রাজপরিবারের নিয়ম আনুযায়ী সাত বছর পার না হলে রাজকুমার কিংবা রাজকুমারীর জন্মদিন পালন করা হয়না। রাজমাতার অনুমতি চাই - গম্ভীর জবার দেন রাজা।

আজ সবে মাস পয়লা অথচ আচমকা ঝরে পড়া বৃষ্টির গতিক দেখে মনে হচ্ছে বর্ষাকাল এসে গেছে দেশের সিংহ দুয়ারে।

দরকার হলে আমরা যাবো মহারাজ। রাজমাতার মহলে গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসব - এতক্ষণ পরে তরোয়াল ঝন ঝন করে সেনাপতির কোমরে।

বৃষ্টির হাবভাব তো মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না মহারাজ। প্রহরীদের কী পাঠিয়ে দেব রাজবাঁধে। এমনিতেই উত্তর দেশের জল বাঁধের ভিতর ঢুকে থৈ থৈ অবস্থা। তারপর এই অসময়ের বৃষ্টি - রাজার অনুমতি চান নগরপাল।

আপনারা বসুন। আমি আসছি — দরবার ছেড়ে অন্দরমহলে চলে যান রাজা। রূপকথার সঙ্গে গল্প জমিয়ে জেনে নিতে হবে সবকিছু।

জানালার গরাদে দাঁড়িয়ে কী করছো মামণি ? রাজকুমারী রূপকথার পিঠে আলতো হাত রাখেন রাজা।

এই একটু রানির সঙ্গে গল্প করছি — একই ভঙ্গিতে বাইরের আকাশের দিকে নজর ছুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে রূপকথা — জানো বাবাই, রাখালরাজাটা বড্ড বোকা। ভিজে ভিজে রানির সঙ্গে খেলা করে। জ্বর আসলে কী হবে ? তুই তো বাপু শুয়ে থাকবি বিছানা জুড়ে। গরু ছাগল গুলোকে চরাতে নিয়ে যাবে কে ? ঘাস না খেলে ওরা কি থাকতে পারবে ? খিদেয় কাঁদবে। হাম্মা হাম্মা। ব্যা এঁ ব্যা এঁ। তাই না বাবাই ?

মেয়ের কথার ল্যাজা-মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারেন না রাজা। জানতে চান— কে তোমার রানি ? কোথায় তোমার রাখাল রাজা ?

ওমা, তাও জানো না ? চোখ না ফিরিয়েই অবাক হয় রূপকথা - বর্ষা হলো ঋতুরানি। আর রাখাল রাজাকে তুমি দেখতে পাবে না।

হবে হয়তো — মনে মনে ভাবেন রাজা। ছোটদের এমন অনেক অদৃশ্য বন্ধু থাকে যাদের হদিশ পায় না বড়রা। ছোটরা একান্তে তাদের সঙ্গে গল্প করে। খেলে। নাচ গানে মেতে থাকে।

জানো বাবাই, রানি কি বলেছে ? এবার রাজার মুখোমুখি হয় রূপকথা।

কী বলেছে ?

বলেছে এবার একটু আগে চলে এলাম। তোমরা তো দেশ জুড়ে অনেক গাছ লাগিয়েছো। সেই গাছগুলোয় জল ঢেলে বাঁচাতে হবে তো - বেনী দুলিয়ে, দু'চোখের পলক নাচিয়ে শুনিয়ে দেয় রূপকথা — এবার তাই বর্ষাবরণ উৎসব হবে না। তারচে বরং চলো যাই। ঠাম্মা আর মাম্মিকে নিয়ে মাঠে যাই। রানির মেঘ ভাঙা জলে ভিজে রাখালরাজার সঙ্গে

একটু লুকোচুরি খেলে আসি।

কিন্তু বর্ষাবরণের দিন যে ঠিক হয়ে গেছে। পনের তারিখ। তোমার জন্মদিনের দিন – মেয়ের মাথায় হাত রাখেন রাজা।

আমার জন্মদিন ? কী মজা ! কী মজা ! তালি বাজায় রূপকথা। তারপর হঠাৎ দু'হাত মেলে দেয় জানলার বাইরে — শুনলে রানি ? আমার জন্মদিন। পনের তারিখ। তার আগেই কিন্তু জলে ভরিয়ে দিতে হবে রূপনদী। রাখাল রাজা, ও রাখাল রাজা, আমাকে একটা পাল তোলা নৌকো বানিয়ে দেবে ?

মেয়ের কথা শুনে আঁৎকে ওঠেন রাজা। রূপনদীর নামই তো ভুলে গেছিলেন। রূপনদীতে সারা বছর জল থাকলে দেশের চেহারাটাই যে বদলে যেত। বর্ষাকালে জল একটু জমা হয় ঠিকই কিন্তু শরৎ আসতে না আসতেই নদী আর নদীতে থাকে না। শুকনো খটখটে বালিচরা পথ হয়ে যায়। আর নৌকো ? রূপনদীতে কোনওদিন নৌকো চলতে দেখেনি রূপনগরের প্রজারা।

এবার চলবে। নৌকো চলবে। জাহাজ চলবে — রাজার মনের কথা নিজের মুখে কেড়ে নেয় রূপকথা। হাত ধরে রাজার – আমি তো কখনও নৌকো চড়িনি। এবার চড়ব। নৌকোয় চড়ে দুলতে দুলতে গান গাইব। নাচ করব। জন্মদিনের ফানুস আকাশে উড়িয়ে দেবো। আচ্ছা বাবাই, নৌকোয় কি নাগরদোলা বসানো যায় ?

যায় হয়তো। আমার জানা নেই—

খুউব বড় একটা নৌকো তৈরি করতে হবে। মেলার মঠ থাকবে। নাগরদোলা চড়কি থাকবে। জন্মদিনের আসর থাকবে। ফুলের বাগান থাকবে। থাকবে প্রজাপতির দল। মেঘের ঘর থেকে বর্ষারানি ছড়িয়ে দেবে টাপুর টুপুর বৃষ্টির ফুল। গরু চরানোর ফাঁকে রাখালরাজা বাজাবে তালপাতার বাঁশি। পক্ষীরাজে চেপে কিবিস কিরিস এসে নামবে রাজকুমার। তারপর আমরা সবাই মিলে রূপকথা নদীতে ভাসতে ভাসতে পৌঁছে যাবো সাগরে। সাগর থেকে পাহাড়ে। পাহাড় থেকে আকাশে —

থাক থাক, মেয়েকে কোলে তুলে নেন রাজা।

তোমার রাজকুমারীর জন্মদিনে এমন বর্ষাবরণ, বলতে বলতে রাজার কোল ছেড়ে গালিচা বিছানো মেঝেয় নেমে পড়ে রূপকথা, আমি যাই রানি ডাকছে। রাখালরাজা ডাকছে। তোমরা এসো। সবাই মিলে ভিজতে ভিজতে লুকোচুরি খেলব। এক্কা দোক্কা আর গোল্লাছুট।

দাঁড়া, রূপকথা দাঁড়া। অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হবে — মেয়ের পিছু নেন রাজা।

অসময় নয়। বর্ষা এসে গেছে। টাপুর টুপুর বৃষ্টি নূপুর। ঝম্ ঝমা ঝম্ বাজছে নূপুর। চলে এসো বাবাই। মাম্মা মাম্মি সবাই।

আঁকার খাতায়
সুপর্ণা ভৌমিক চক্রবর্তী

একটা পাখি ডাকছে কেমন মিষ্টি সুরে
সাদা তুলোর মেঘ ছড়ালো আকাশ জুড়ে
ভোরের বাতাস শিউলি-গন্ধে রোজ ভরে যায়-
বৃষ্টি এখন আঁকছি না এই খাতার পাতায়।

যেই থেমেছে টাপুর টুপুর অমনি আলো
কোত্থেকে সব খুশি এনে মাঠ ভরালো।
ছেলের দলও আনমনা, দেয় পড়ায় ফাঁকি —
আমিও এখন নীল রঙে তাই আকাশ আঁকি।

রং ছড়িয়ে আঁকব এখন পদ্মপুকুর
আঁকতে পারি ফুটফুটে ওই মুখটা খুকুর
দুই হাতে যার নরম সাদা কাশের গোছা —
আঁকছি কেন, খুব কি কঠিন সেইটি বোঝা ?

নিত্যি যাদের সঙ্গী লড়াই, বিষন্নতা
তাদের মুখেও আঁকব হাসি, সুখের কথা
স্বপ্ন এঁকে রাখব দুটি চোখের পাতায় —
সেই ছবিটাই হচ্ছে রঙিন আঁকার খাতায়।

ক্রিকেটার গাবলু
শাঁওলি দে

ব্যাটবল হাতে নিয়ে ও পাড়ার গাবলু
স্কুল ব্যাগ ঘরে ফেলে মাঠে গিয়ে জুটল।
সচিন হবেই সে দু'চোখে তার স্বপ্ন
ব্যাট তুলে খুব জোরে ছয়টা সে হাঁকল।

গাবলু গাবলু করে মাঠ জুড়ে হইচই,
পড়াশোনা গুলি মারো খেলে সে জিতবেই।
আবার বল এলে রেডি হল গাবলু,
তুলে মেরে দেখে চেয়ে বলটা গেল কই ?

বল নেই, মাঠ নেই সব গেল হারিয়ে
হইচই কিছু নেই, সব গেছে পালিয়ে
স্বপ্নটা ভেঙে গিয়ে দেখে চেয়ে গাবলু
বইখাতা হাতে নিয়ে মা যে আছে দাঁড়িয়ে।

কথার পিঠে

প্রণব হোড়

অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের অন্যতম সাড়া জাগানো লেখক অখিল নিয়োগী যাঁর ছদ্মনাম ছিল স্বপনবুড়ো। ১৯০২ সালে অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার টাঙাইল মহকুমার সাঁকরাইল গ্রামে এই বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জন্মগ্রহন করেন। ছোটদের এই সব্যসাচী লেখক লিখেছেন গল্প, ছড়া, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, জীবনী, নাটক সবকিছুই। অধুনালুপ্ত যুগান্তর পত্রিকার ছোটদের পাততাড়ি এই কিশোর বিভাগটি সম্পাদনার সময় থেকেই স্বপনবুড়ো এই নামটি শিশু কিশোরদের মনের মণিকোঠায় ঠাঁই পেয়ে যায়। তখনকার বিশিষ্ট কিশোর পত্রিকা রামধনু, শিশুসাথী, মৌচাক, মাসপয়লা প্রভৃতির পাতায় স্বপনবুড়ো নানা ধরণের এবং নানা মেজাজের অজস্র কিশোর মনোগ্রাহী গল্প লিখে গেছেন। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর তিনটি কিশোর গ্রন্থ- বাঘমামা, পরির দৃষ্টি এবং স্বপ্নপুরী। স্বপনবুড়ো এই মনভোলানো রূপকথার নামটির সঙ্গে মামানসই ছিল লেখকের ঢোলা হাতাওয়ালা রংচঙা জামা, লম্বা দাড়ি আর নাকের ওপর ঝুলে থাকা সাবেকী ফ্যাশানের চশমা। এ ভাবেই ভালোবাসার স্বপনবুড়ো শিশু-কিশোর জগতে স্বপ্ন ফেরি করে বেড়াতেন। ইংরেজি ১৯৫২ সালে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ভিয়েতনাম আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর এই আকর্ষণীয় বিদেশ ভ্রমণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" গ্রন্থটিতে। যুগান্তর পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি জনহিতকর কিশোরদের নিজস্ব সংগঠন "সব পেয়েছির আসর" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন মানুষটিকে বিদ্যাসাগর পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।

সারাজীবন ধরে অজস্র গল্প লিখে গেছেন স্বপনবুড়ো। অধুনালুপ্ত শিশুসাথী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সাড়াজাগানো ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস 'বেপরোয়া'। তারপর একে একে লেখেন সুখপাঠ্য কিশোর উপন্যাস 'বাবুই বাসা বোর্ডিং', 'শশী শ্যামলের সাঁকো'। তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে শুভঙ্কর সামাজিক বোধ, আদর্শ চরিত্র গঠন এবং জীবনের কল্যাণশ্রীমণ্ডিত দিকগুলিই ফুটে উঠেছে। তাঁর জনপ্রিয় ভৌতিক উপন্যাস 'রাত্রে নাম করতে

এক মলাটে দুই কথাশিল্পী

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

মানা' শিশুসাথী পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৩ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নদিয়া জেলার হৃদয়পুর গ্রামে ১৯০২ সালে জন্মেছিলেন স্বনামধন্য চিত্রাঙ্কন শিল্পী প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু অসাধারণ ছবি আঁকা নয়, রেখার সঙ্গে লেখার ক্ষেত্রেও প্রতুলচন্দ্র ছিলেন অসামান্য সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী। বিশেষ করে শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ এবং অনায়াস বিচরণ। ১৯২৭ সালে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে অঙ্কনবিদ্যাকেই তিনি স্বাধীন পেশা হিসেবে গ্রহন করেন।

প্রথম জীবনে বিশিষ্ট অঙ্কন শিল্পী পরেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে শিক্ষানবিশী করেছিলেন প্রতুলচন্দ্র। পরবর্তীকালে পেশাগত জীবনে নামী-দামী বহু প্রকাশনা সংস্থার অসংখ্য গ্রন্থের অসামান্য সব ছবি এঁকেছেন। চিত্রাঙ্গনে তাঁর প্রতিভা ও দক্ষতা ছিল সংশয়াতীত। সে সময়কার সাড়া জাগানো শিশু ও কিশোর পত্রিকা মাসপয়লা এবং শুকতারার সঙ্গে তিনি সুদীর্ঘকাল অঙ্কনশিল্পী হিসেবে যুক্ত ছিলেন। ছোটদের উপযোগী নানা ধরনের রচনায় এই শিল্পী মানুষটির হার্দ্য এবং মরমী সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এই বিশিষ্ট শিল্পী তাঁর অসামান্য দক্ষতার জন্য। সেখানে তিনি নির্বাচিত গ্রন্থের রেখাচিত্র এবং অলঙ্করণ করে যথেষ্ট খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেছিলেন। প্রতুলচন্দ্র অঙ্কিত এবং রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করা যায় মিষ্টি ছড়া, নলদময়ন্তি, এক যে ছিল শেয়াল, ছোটদের রামায়ণ প্রভৃতি। সুসাহিত্যিক এবং কবি সুনির্মল বসুর সহযোগে 'অপরূপ কথা' গল্প গ্রন্থটি প্রতুলচন্দ্রের দক্ষতা এবং প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করেছে। ১৯৫৭ সালে এই বিশিষ্ট মানুষটি নবদ্বীপ মণ্ডল কংগ্রেস কর্তৃক তাঁর দক্ষতার জন্য সংবর্ধিত হন।

শিশু ও কিশোর সাহিত্যে বেশ কিছু সাড়া জাগানো গল্প লিখেছেন শিল্পী প্রতুলচন্দ্র। স্বনামধন্য দেব সাহিত্য কুটিরের এক সময়কার অবিস্মরণীয় পুজো সংখ্যা গুলিতে এই সব উপভোগ্য গল্প চোখে পড়ে। চিত্র শিল্পীর বর্ণালী তুলির ভাষাকে তিনি আশ্চর্য সাবলীলতায় ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন ওই সব মনোগ্রাহী গল্পে। গভীর সমুদ্রের জলচর প্রাণীদের কথা ধরা পড়েছে 'নীল সায়রের বিভীষিকা' গল্পে। ১৯৭৪ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

হেমন্তের রং
অনিতা অধিকারী

হেমন্ত রং ছোঁয়ালো ধানের শিষে
যেখানে গলছে সোনা ইচ্ছে মিশে
যেখানে আন্নাকালী শাক তোলে রোজ
যেখানে বাতাস মুখর পাখির শিসে।

হেমন্ত ভোরের বাতাস ছুঁইয়ে দিলে
শালুকও দল মেলে দেয় পুকুর ঝিলে
অলিদের নৃত্যগীতি হাওয়ার তালে
মেঘেদের খবর পাঠায় শঙ্খচিলে।

হেমন্ত চায় যে খুশি সবার মনে
যারা ঐ মাঠ জুড়ে রোজ ফসল বোনে
যেখানে ঘাম ঝরানোর খেলা চলে
যেখানে স্বপ্ন ভাঙে প্রতিক্ষণে।

হেমন্ত রং ছোঁয়ালো পোড়োর চোখে
সে তাকে ধরবে মেলে বিশ্বলোকে
যে শুধু বই এর পাতায় ইচ্ছে সাজায়
সারদার চরণতলে প্রণাম ঠোকে।

হেমন্ত সোনার আলোয় নেয় রোজই খোঁজ
যেখানে বাড়ির থালেও জোটে না ভোজ
যারা রোজ মরতে মরতে উঠছে বেঁচে
সেখানে বাঁচার মন্ত্র পাঠায় সে রোজ।

খুব সাহসী
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গভীর রাতে ঘরের ভিতর শব্দ কীসের হয়
ঠিক জানিনা, কেঁপে ওঠে বুক ভয় ভয় ভয় ভয়,

ছম ছম চারিদিক পাশেতে কেউ জেগে নেই রাতে
এখন যদি ঘাড় মটকায় কামড়ায় দুই হাতে ?

আসুক দেখি ভূতের দল লাগিয়ে দেব ঘুষি
অমনি আমার সাহস দেখে তোমরা কি সব খুশি ?

এসব কথা ভাবছি একাই মনেতে নেই জোর
রাত গড়িয়ে গড়িয়ে এখন সূয্যিমামার ভোর।

ঝিকির মিকির সেই হাসিতে

সলিল মিত্র

পুজোয় সারা আঙন জুড়ে রইল ছড়া ছড়ানো —
জল ছাপ-ছাপ মাটিতে, আর কলমিলতায় জড়ানো।
সবুজ সবুজ দুব্‌বো ঘাসে
মিট মিটিয়ে ছড়া হাসে
আকাশ ভরা সূর্য্যি তারায় সেই ছড়া বুক ভরানো।
কচি কচি মুখের হাসি
শতক গেলেও হয়না বাসি
ঝিকির-মিকির সেই হাসিতে হাজার মানিক ঝরানো।

কিশোরীর প্রতিবাদ

তপনকুমার বৈরাগ্য

বাল্যবিবাহ রুখতে হবে ঘরে ঘরে
কন্যারা সব বাঁচবে তবে নতুন করে।

ছাত্রীরা সব এগিয়ে এসে রুখে দাঁড়াও
নতুন দিনে পথটি চিনে পা-টি বাড়াও।

কমবয়সে দিচ্ছে যারা মেয়ের বিয়ে
মেয়ের জীবন যাবে ঝরে বোঝাও গিয়ে।

নাবালিকা যেসব মেয়ে করছে পড়া
উচিত হবে তাঁদের বিয়ে বন্ধ করা।

আদায় করে লওগো বাপের প্রতিশ্রুতি
আগে পড়া, পরে বিয়ে, দেবার ব্রতী।

মেয়ের জন্যে বিদ্যালয়ে কত কী দান
পড়াশোনায় থাকুক তাদের মন ও প্রাণ।

ও কিশোরী প্রতিবাদে দাঁড়াও ঘুরে
স্বয়ংসিদ্ধা হওগো যোদ্ধা, মন্দ দূরে।

করিগুরু তুমি হাসতে না ?

সতীশ বিশ্বাস

আচ্ছা বলতো কবিদাদু, চুপি চুপি
ভয় নেই, আমি কাউকেই বলব না।
ছোটবেলা তুমি হতে চেয়েছিলে মালি ;
হতে চেয়েছিলে দইওলা, ফরিওলা,
রাতের প্রহরি ও খেয়াঘাটের মাঝি।
বড় হয়ে তুমি হাসতে না খুব একা,
এইসব কথা পড়ত যখন মনে ?
আরো যে কত কী হতে চেয়েছিলে তুমি
ডাকহরকরা, রাখাল ছেলে ও ইটগাঁথা মিস্তিরি,
এমনকি হতে চেয়েছিলে ভিখিরিও।
কবিদাদু, খুব জানতে ইচ্ছে করে —
নোবেল জেতার পরেও তোমার মনে
কখনো কি দেখা দিত এইসব সাধ ?
পণ্ডিত হতে চাওনি কিছুতে তুমি।
পণ করেছিলে মুর্খ থাকবে বলে।
কি গো দাদু, তুমি পারলে রাখতে কথা ?
নিজেই এসব ভেবে কি পাও নি মজা ?
বাল্যের সেই হত-চাওয়াগুলো দাদু,
কতদিন ছিল বল না তোমার মনে ?
বড় যেই হলে, হারিয়ে গেল কি সব ?
নাকি বেঁচে থেকে হৃদয়ের তলে তারা
ঋদ্ধ তোমাকে করে গেছে এক অদ্ভুত রসায়নে।
যা যা ভেবেছিলে শৈশবে মনে মনে,
বড় হয়ে তুমি হলে না কিছুই তার।
শুধু হাতে নিলে কাগজকলম তুলে।
আকাশে উড়িয়ে বই, কবিতার পাতা —
টোকা মেরে তুমি আলোর দরজা-
খানাকে দিয়েছ খুলে।

পুজোর দিনগুলি ছোট বড় সকলেরই ভালো কাটুক।
সবাই আনন্দে থেকো/থাকুন।
আগাম শারদ শুভেচ্ছা জানাই সকলকে।

বাংলাদেশের লেখা

সেই পাখিটি

ইমরান পরশ

একটি পাখি রোজ সকালে গান শোনাত আমাকে
তিথির সাথে যেত ছুটে তুলতো ডেকে মামাকে।
ঘুরতে যেত নদীর ধারে মনে খুশির ভেলা
তার সাথে যে শিশির কণা করত বুঝি খেলা।

মেঘের মেয়ে টিনের চালে যেই বাজাত নূপুর।
সেই পাখিটির মনে খুশি খেলত টাপুর টুপুর।
এই পাখিটি নদীর জলে খেলত যে ডুব সাঁতার
তাকে নিয়ে স্বপ্নেরই জাল বুনেছিল মা তার।

মন ছিল তার আকাশ ছোঁয়া খুশির ঝিলিক চোখে
হঠাৎ করে সেই পাখিটি যায় ভাসিয়ে শোকে।

এই শহরে এক জোনাকি

নাসিরুদ্দীন তুসী

এই শহরে এক জোনাকি হঠাৎ কোথা থেকে
আসলো উড়ে গাঁয়ের সবুজ বন-বনানী রেখে
এই শহরে, এই শহরে
উড়ছে দেখি সাঁঝপ্রহরে
উড়ছে এঁকেবেঁকে।

ও জোনাকি,
নীল জোনাকি কেমন করে এলি !
ছিলি কারো বুকপকেটে
আসলি উড়ে, নাকি হেঁটে
পথ ভুলে তুই আসলি কি রে হাওয়ায় পাখা মেলে ?
এক ঝলকে এক পলকে গ্রামের আকাশ ফেলে।
নিয়নবাতির অন্ধকারে
না থেকে দূর বনের পারে
গেছিস বুঝি চলে ?
আদর করে রাখবো ধরে আবার দেখা হলে।

ও জোনাকি,
নীল জোনাকি আছিস কি রে ভালো ?
স্বপ্নছেঁড়া মানুষগুলোর, বুকে জ্বালিস আলো !

এই

আসলাম সানী

এই ছেলেটি বন্ধু আমার
এই মেয়েটি বোন
এই তো আমার শিশু-কিশোর
দৃপ্ত এ জীবন,

এই গ্রামটি প্রিয় আমার
এই মাটি যে মায়া
এই প্রকৃতি-বৃক্ষ-সবুজ
দিচ্ছে আমায় ছায়া,

এই যে কৃষক পিতা আমার
মুক্তিযোদ্ধা ভাই
মায়ের শাড়ির আঁচল তলে
স্বর্গ খুঁজে পাই,

রফিক-সালাম-বরকতেরই
বাংলা ভাষায় গাই
এই তো আমি বাংলাদেশের
বীর শহিদের ভাই,

এই ছেলেটি আমার সঙ্গে
নদীর কাছে যায়
এই মেয়েটি আমার সঙ্গে
সাগরে হারায়।

ইচ্ছে থাকে জেগে
নীহার মোশারফ

কলম খাতা বই'নে যখন
পড়তে বসে খুকু
সুপ্তা দিদির ছোট্ট মেয়ের
সঙ্গে আসে কুকু।

খুকু খুকু পড়া রেখে
বেড়ায় মেঘের ভেলায়
কখনো বা মাঠে ঘাটে
চুরুলিয়ার মেলায়।

ওদের ভেতর স্বপ্ন হাজার
বড় হওয়ার আশা
দু'চোখ জুড়ে বাসা বাঁধে
দেশের ভালবাসা।

খুশির নদী বইতে থাকে
ইচ্ছে থাকে জেগে
ওদের বাবা শান্ত থাকে
কয় না কথা রেগে।

ষাঁড়ের গুতো
জ্যোতির্ময় মল্লিক

মাঠের মাঝে ঘুরে ঘুরে
খাচ্ছিল ঘাস ষাঁড়ে,
কোত্থেকে এক ভোমরা এসে
হুল ফোটালো ঘাড়ে।

হুলের বিষে লাফিয়ে ওঠে
দু'নাক দিয়ে আগুন ছোটে,
ষাঁড়ের গুতোর শিকার হল
পিযুষকান্তি পাড়ে।

একটি গুতোয় পিযুষ বাবু
বেজায় রকম হলেন কাবু
বদ্যি এসে বলল দেখে
আঘাত পিঠের হাড়ে।

টিয়ের বিয়ে
নাজমুল হাসান

টিয়ে পাখি টিয়ে পাখি
আজকে তোমার বিয়ে,
লজ্জা পেয়ে বসে আছো
ঘোমটা টেনে দিয়ে।

গাছের ডালে ডেকোরেশন
জ্বলছে রঙিন বাতি,
রঙ মেখে সব সঙ সেজেছে
করছে মাতামাতি।

মগডালেতে বরের আসন
সঙ্গীরা বটগাছে,
বটের লতায় চেয়ার টেবিল
ঝুলিয়ে রাখা আছে।

পেয়ারা বিচির পোলাও এবং
পাকা পেঁপের ঝোল,
টুনটুনি আজ সেই খুশিতে
বাজায় বিয়ের ঢোল।

টিয়ের বিয়ের ধুম পড়েছে
গাইছে বনের পাখি,
কনের সাজে টিয়ে পাখির
লাজুক দুটি আঁখি।

বর এসেছে পাখনা মেলে
টোপর মাথায় দিয়ে,
বিয়ের বয়স হয়নি বলে
পণ্ড হল বিয়ে।

ট্রেন ছোটে
জসীম মেহবুব

আজ যাবো দাদুর বাড়ি
তাই সাজগোজ,
রাত্তিরে সেইখানে
দেব এক ভোজ।
টুনু যাবে টুলু যাবে
আর যাবে টুসি,
সাথে যাবে ছোট মামা
লাগছে কী খুশি।
গাঁট হয়ে ঘাটলাতে
আম খাবো বসে,
আর খাবো মজাদার
লিচু টসটসে।
বড়শিতে মাছ ধরে
ডুলা ভরে নেব,
যদি পাই শোল-টাকি
টুলুটাকে দেব।
ঝুপ করে ঝাঁপ দেব
পুকুরের জলে,
ভয় কী সে বুবু যদি
কান দেয় মলে ?
এত সব ভেবে ভেবে
ট্রেনে যেই চড়ি,
সেই ট্রেন দাদু-বাড়ি
ছোটে তড়িঘড়ি।

ক্লেরিহিউ
মাহবুবুল হাসান

১.
মোহাম্মদ আলী, রিং-এর রাজা
চঞ্চল প্রজাপতি সদা তরতাজা
হুল ফোটাতেন প্রতিপক্ষকে
বুঝিয়ে দিতেন রিং-এর ভেতর দক্ষ কে !

২.
সুকুমার বড়ুয়া
ছন্দের ঘেরা থেকে ন'ন মোটে সরুয়া
ছড়া আর ছন্দে —
জীবনটা কাটালেন আনন্দে আনন্দে।

পরীক্ষা

প্রণব হোড়

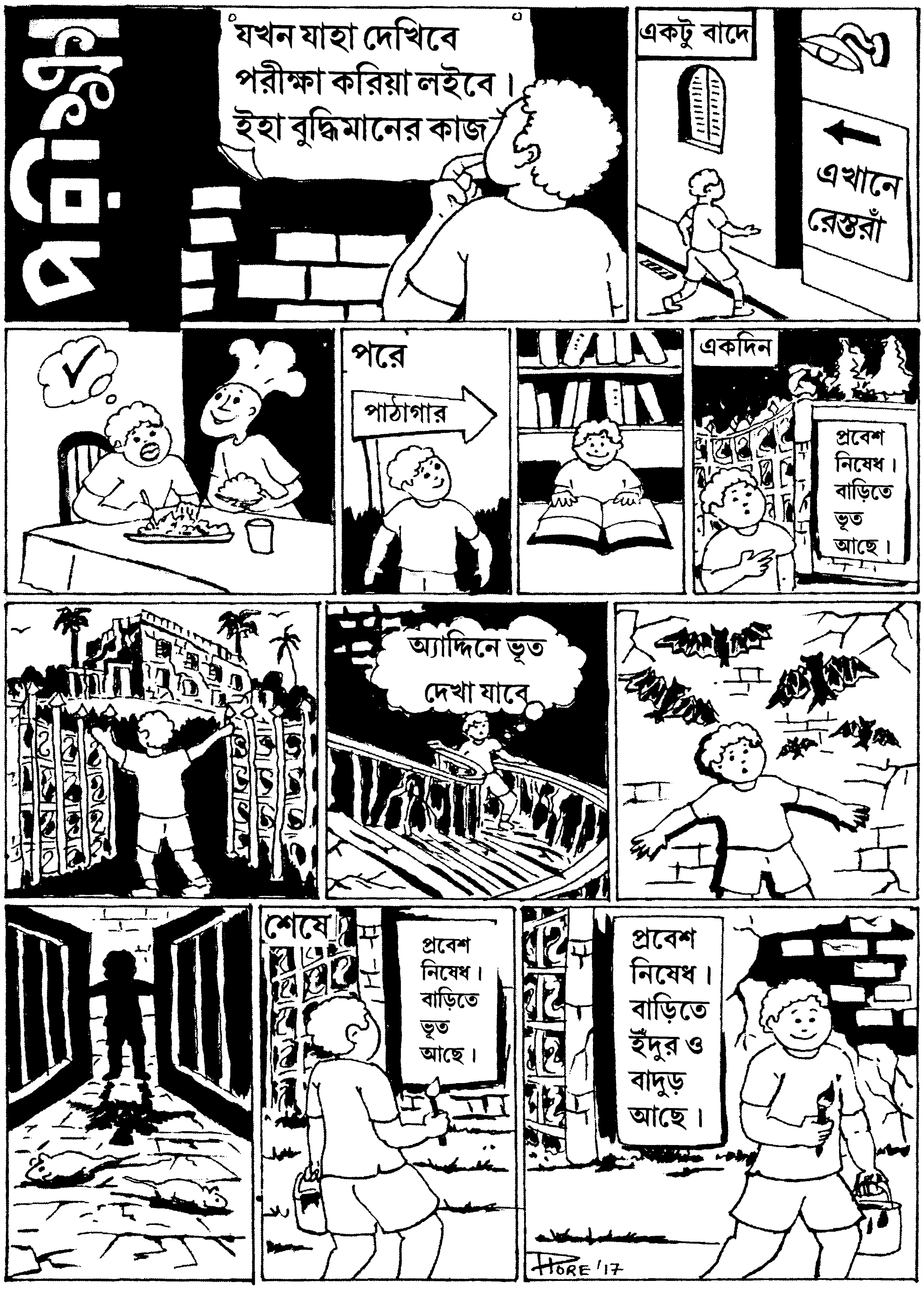
পরীক্ষা
যখন যাহা দেখিবে
পরীক্ষা করিয়া লইবে।
ইহা বুদ্ধিমানের কাজ।
একটু বাদে
এখানে রেস্তরাঁ
পরে
পাঠাগার
একদিন
প্রবেশ নিষেধ। বাড়িতে ভূত আছে।
অ্যাদ্দিনে ভূত দেখা যাবে
শেষে
প্রবেশ নিষেধ। বাড়িতে ভূত আছে।
প্রবেশ নিষেধ। বাড়িতে ইঁদুর ও বাদুড় আছে।
HORE '17

টুকিটাকি বাক্স

অবি সরকার

(HARRY BELAFONTE'র গান TIKI-TAKI BOX এর সুরে)

বাঁকা ছিপ্পু লাল লাট্টু
আমের আট্টি ভাঙা টাট্টু
লুকোনো সেই ভালোবাসা
একই বাক্সে আছে ঠাসা
ছোট্ট বেলা ফিরে আসছে
ছেলেবেলার টুকিটাকি।

কাটা ঘুড়ি লাল মাঞ্জা
নীল পেন্সিল ছেঁড়া পাঞ্জা
কত্তো ছবি রঙে ঠাসা
এক বাকসো ভালোবাসা
ধুলো ময়লা ঢেকে থাকা
শত শত্তক টুকিটাকি।

দিম্মা বলত কত গল্প
ছেঁড়া খোঁড়া স্মৃতি-কল্প
খড়ি মিট্টি ছেঁড়া গুলতি
এটা রূপসা এটা ফুলদি
ফাঁকা শিশি ভাঙা ঢাকনা
প্রজাপতি কিন্তু পাখনা
একই বাক্সে ঠাসাঠাসি
ভুলে ভরা টুকিটাকি।

কত মৌ-মাস কত বর্ষা
কত গ্রীষ্ম কালো-ফর্সা
চুলের ফিতে পুঁতির মালা
মেজো মামার ছোট্ট তালা
চাবি নেই তার আছে শুধু
স্মৃতি মাখা টুকিটাকি।

ধুলো ময়লা বর্ষপঞ্জী
চিলে কোঠার শতরঞ্জি
ভেজা গন্ধে ডাকে শৈশব
কোথা মঞ্জুস কোথা কই সব
কাছে নেই কেউ ভরা বক্সে
কত কিছু টুকিটাকি।

দেখি সব জলময়

ফণিভূষণ হালদার

উড়ু উড়ু মেঘ আসে চলে যায় ঘুরে ঘুরে,
কষ্টকে নিয়ে যায় কোন সে অচিনপুরে।
বৃষ্টিটা কম হয় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি,
আনমনে মনে হয় ভেসে যাবে সৃষ্টি।
রিম্ ঝিম্ ঝম্ ঝম্ লাগছে না মন্দ,
বাতাসেতে ভেসে আসে কেতকীর গন্ধ।
জল খায় ধান গাছ শাপলার ফোটে ফুল,
পরিমল সুবাসেতে ছুটে আসে অলিকুল।
মাঠে মাঠে চাষিদের আনন্দ ঝরে পড়ে
বরষার দাপটেতে জল ঝরে কুঁড়েঘরে।
কাঁঠালি চাঁপার বাস ঘোরে সারা পাড়াময়,
চারিদিকে নজর যায় দেখি সব জলময়।

বর্ষার গান

মোহাম্মদ আলী বুলবুল

রিম ঝিম রিম ঝিম
বৃষ্টি পড়ার গান
মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে
সারা আশমান।

বায়ু বয় বায়ু বয়
এলো মৌসুমী
রাজাবাবু হাতে নিয়ে
বাজায় ঝুমঝুমি।

জল পড়ে পাতা নড়ে
ফুল ফোটে বনে
কবি তাই ছড়া লেখে
বসে আনমনে।

দাড়ি বুড়ো
ঈলিতা চট্টোপাধ্যায়

'দাড়িবুড়ো' তোমায় সবাই 'ঠাকুর' বলে মানে,
আজকে তোমার জন্মদিনে, খুশি সবার প্রাণে —
জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাই, তোমার গানই বাজে —
রজনীগন্ধা, জুঁই আর বেলে তোমার মূর্তি সাজে।
তোমার বিশাল রচনার ডালি চারদিকে আছে ছড়িয়ে
নানান ঋতুতে, দুঃখে সুখে মনকে রেখেছো ভরিয়ে।
জন্মদিনে নিজেকে নিয়েও রচনা করেছো গান —
রবীন্দ্র কবিতা, গল্প ও গানে ভরে থাকে মন প্রাণ।
দেশে-বিদেশে, দিকে-দিগন্তে ছড়িয়ে তোমার নাম —
জন্মদিনে জানাই তোমায় শত-কোটি প্রণাম !!

ছাত
সুমিতকুমার বেরা

তোমার আছে বাংলো বড় আমার ছোট ঘর,
গুলঞ্চ আর গন্ধরাজের নিত্য স্বয়ংবর।
তোমার আছে বন্দী পাখির মিথ্যে আলাপন,
আমার আছে পায়রা চড়াই সঙ্গী সারাক্ষণ।
তোমার আছে দেওয়াল ঘেরা মস্ত বাগান বাড়ি,
সকাল থেকে বন্ধ কপাট সবার সাথে আড়ি।
আমার আছে সবুজ মাঠে অবাধ ছুটো ছুটি,
নরম ঘাসে হাওয়ার সাথে খুশির লুটোপুটি।
তোমার আছে ইঁদুর, ই-মেল আমার সহজপাঠ,
কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি শুক্রবারের হাট,
তোমার আছে তীব্র আলোয় হারিয়ে যাওয়া রাত,
আমার আছে মুক্ত বাতাস, জ্যোৎস্না ভেজা ছাত।

পুজোর আনন্দতে
অসিত দলপতি

রাগ করেছে খুকুমনি সকাল থেকেই আড়ি
এবার পুজোয় কিনবে ভালো ঢাকাই দামি শাড়ি।
বাপি বলল, অফিস ছুটি চলো না যাই দূরে,
রেল ঝমাঝম্ হাওড়া থেকে একটু মধুপুরে।
হাওয়া বদল শরীর স্বাস্থ্য থাকবে ভালো মন
টিভি চ্যানেলে দুগ্গা মাকে দেখব সারাক্ষণ।
শরত মানে পুজোর দিনে কেবল পায়ে হাঁটা
দোকানদানি, গলির মোড়ে শুধুই কেনা কাটা।

পাখিদের সাথে
শঙ্করকুমার চক্রবর্তী

পথে পথে ঘুরছি পাখিদের খোঁজে
ওরা এখন ব্যস্ত খেতে ভুরিভোজে।
নদী পাড়ে বটগাছে অনেকের বাসা
দূরবিনে দেখে মনে জাগে ভালোবাসা।

আড়ালে যে বসে ডাকে পাখিটাকে চিনি
লাল ঝুঁটি ছোট পাখি বুলবুলি তিনি
ডানা মেলে পালকের যত্নতে মন
এই পাখিটাকে নাকি দেখা সুলক্ষন।

ফল খাওয়া পোকা খাওয়া, সুমধুর ডাক
আরো বেশি গাছে ওরা আশ্রয় পাক
লাল মুনিয়াকে দেখি ডালে বসে একা
মন খুশি হয়ে যায় বেনেবউ দেখা।

আর দেখি উড়ে যাওয়া টিয়াদের ঝাঁক
আকাশের বুক চিরে সুমধুর ডাক
আশেপাশে ঘুরছে তিনটি শালিক
এই এলাকার ওরা আজকে মালিক।

জোড়া পাখি ফিঙে দোল খায় তারে
দোয়েলের ডাক শুনি যেন বারে বারে
আছে কোথাও আশেপাশে দেখা দিক ওরা
রোজ আসে বাড়িতে ছাতার একজোড়া।

চলে গেলেন সঞ্চিতার শুভানুধ্যায়ী

সন্দীপ সরকার

বাইদ বহাল পত্রিকার সম্পাদক সন্দীপ সঞ্চিতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অনেক দিন ধরেই। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মাহত।

পথ চলেছি

গোপাল কুম্ভকার

স্বপ্ন আমায় দেখতে শেখায়
পূর্ণশশীর মায়া
আলোর কদর দেয় বুঝিয়ে
আঁধার রাতের ছায়া।

আকাশ উঁচু ওড়ার নেশা
ধরায় উড়াল পাখি
পাখার হাওয়ার নরম আরাম
নিত্য জানায় শাখি।

বুক চিতিয়ে লড়াই করার
সাহস জোগায় গিরি
ঝড়-ঝঞ্ঝায় বাঁচতে শেখায়
পলাশ পাতার তিরি।

মাটির থেকেই সহ্যগুনের
বিদ্যা কুড়াই আমি
সমুদ্র দেয় উদারতা
সবার চেয়ে দামি।

সাম্যবাদের মন্ত্র খুঁজি
সূর্য-সোহাগ থেকে
এসব নিয়েই পথ চলেছি
বনের স্নেহ মেখে।

নাম বিভ্রাট

প্রণব হোড়

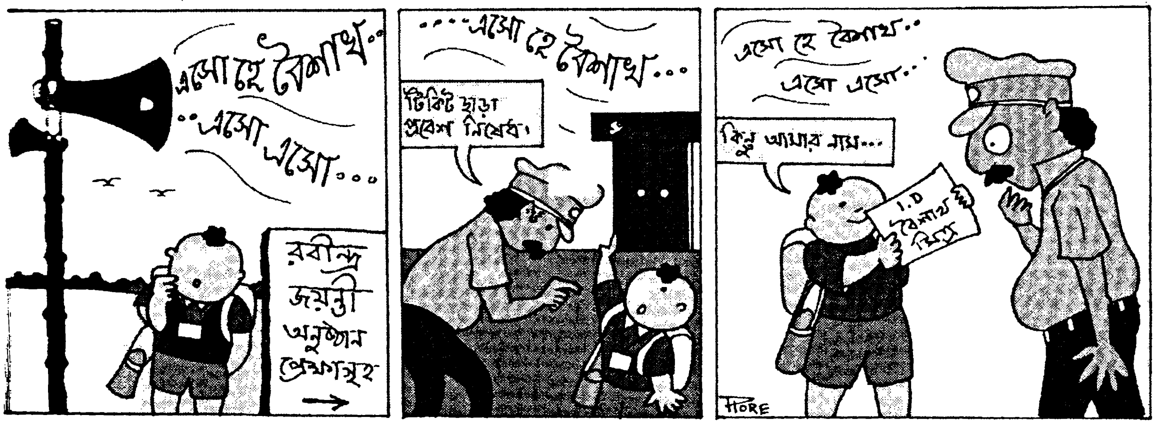

সঞ্চিতার পাঠক পাঠিকা ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীদের অগ্রিম শারদ শুভেচ্ছা জানাই। সবাই ভালো থাকুন এই কামনা করি।

নিষিদ্ধ

প্রণব হোড়

জঙ্গলে বাঘ শিকার নিষিদ্ধ
পাখি ধরা নিষিদ্ধ
গাছের ফুল তোলা নিষিদ্ধ
ঘাসে পা দেওয়া নিষিদ্ধ
এটাই দেখছি শুধু নিষিদ্ধ নয়
HORE

নদীর তীরে

মদন চক্রবর্তী

বনের ভেতর ছোট্ট নদী দুই ধারেতে চর
মধ্যখানে ঐ দেখা যায় ছোট্ট কুঁড়ে ঘর।
বন্ধু ছিল ছোট্ট নদী ছিল গাছ-পালা,
তাদের সাথে দিন কাটত সকাল সন্ধ্যেবেলা।
যখন আমি বড় হলাম পড়ল মনে সব
আজও যেন ঐ শোনা যায় নদীর কলরব।

ছবি আঁকা

পরিমল ঘোষ

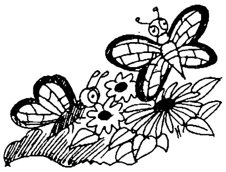

রং ও তুলি হাতে নিয়ে ভাবছে মনে মনে,
কীসের ছবি আঁকবে তুমি অবসরের ক্ষণে।
এত ভাবার কিবা আছে ? তাকাও চোখ মেলে,
কত ছবি যাচ্ছে দেখ তোমার সামনে খেলে।

নীল আকাশের বুকে ঐ সাদা মেঘ ওড়ে,
দু-চারটে পাখি দূরে আপন মনে ঘোরে।
মাটির বুকে ফুলের বনে নানা রঙের মেলা,
তারই মাঝে উড়ে উড়ে প্রজাপতির খেলা।

এসব নিয়ে ছবি আঁকো তোমার ইচ্ছে যত,
সঙ্গে কিছু জুড়তে পারো কল্পরাজ্যের মতো।
রং মিলিয়ে আঁকো ছবি খুলে মনের দ্বার,
সবাই দেখে খুশি হবে, বলবে- চমৎকার।

হার জিৎ

প্রবীর জানা

[illegible] দিয়েছে নগদ টাকায় এরপরেও দাওনি মাল,
বলছ আবার করবে খুন কেস করেছে তাইতো কাল।
[illegible] ছেড়ে মস্তানি যে পালিয়ে ছিলে হরিদ্বারে,
[illegible] আমি রুলের গুঁতো হাসছ তবু বারে বারে।
[illegible] তুমি বলব কী আর চড় মেরেছি দু-তিন ঘা,
[illegible] হেলদোল কী যে করি সরছে না তো মুখে রা।
[illegible] লোকটা ও সি মশাই কাঁদব না আমি সাত চড়ে,
[illegible] প্রমাণ শান্ত যে তাই মারুন যতই এরপরে।
[illegible] মাপ জানেন সবাই করিনিতো একটিও খুন,
[illegible] এসব ওসির তখন চিন্তায় হয় মুখটা চুন।

মাকে চিঠি

রমেন রায়

মায়ের কাছে চিঠি লেখে ছোট্ট খুকুমণি
আসছি বলে চলে গেলে রোজই তো দিন গনি।

ভালো হয়ে গেছি আমি যা দেয় তাই খাই
আমি তো আর বলিনাকো এটা ওটা চাই।

অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমায় আর কষ্ট দেবোনা
আছি আমি আগের মতই মোটেও তুমি ভেবোনা।

বিশ্বাস ঠিক হল না তো ? লুকিয়ে দেখো তুমি
আমায় ছেড়ে কেমন আছো ? ভালো লাগছে শুনি!

বাহন কাহিনি

তপোন দাশ

কত বছর ধরে দেখি একই রকম বাহন,
গণেশ নেংটি ইঁদুর গত যুগের কাহন।

কেতো ভায়া ময়ূর নিয়ে আসে একই ভাবে
সরস্বতীর সাথে হাঁস ঠিক দেখতে পাবে।

লক্ষ্মী থাকে পেঁচার পাশে এটাই নাকি রীতি,
দেবী মায়ের সিংহ দেখে আর কী লাগে ভীতি।

আসুক দেবী নয়া বাহনে একটু বদল হোক,
অবলুপ্ত প্রাণীগুলোর কমুক কিছু শোক।

মা তুমি দুর্গা

রণজিৎ হালদার

মা তুমি দুর্গা দুর্গতি হরা মা তুমি শক্তি সাহস বল,
দুখীর দুয়ারে সান্তনা বারি ছিটায়ে মোছাও চোখের জল।
মা তুমি শরতে শারদার বেশে সবুজ সুষমা ভরালে বেশ
শেফালি দোপাটি কাশ শতদল টগরে সাজালে তোমার দেশ।
দশভুজা তুমি অসুর দলনী অশুভ শক্তি করো বিনাশ,
অভয়া বরদা রূপেতে তোমার অভয় আশিস বাঁচার আশ।
শিবের ঘরনী পার্বতী রূপে ছেলে মেয়ে সাথে পূজি তোমায়,
আগমনী গানে বরণ করি মা মাথা নত করি তোমার পা'য়।
মা তুমি দুর্গা জগৎজননী সুখে-দুখে-শোকে তুলনা নাই
মহা মিলনের মহা উৎসবে তোমার করুণা যেন মা পাই।

একটা ছড়া
তপনকুমার দাস

একটা ছড়া গোলাপ-টগর
শালুক-পদ্ম-বকুল,
একটা ছড়া বেল-দোপাটি
আশোক কিংবা শিমুল।

একটা ছড়া স্বপ্ন ঘেরা
তেপান্তরের মাঠ
একটা ছড়া রবি ঠাকুর
এবং সহজ পাঠ।

একটা ছড়া ছোট্ট খুকুর
গালভরা সেই হাসি
একটা ছড়া হাসনাবাদের
আমার মিষ্টিমাসি।

একটা ছড়া দূর আকাশের
সূর্য কিংবা তারা
একটা ছড়া পাহাড় থেকে
নামা ঝর্ণা ধারা।

একটা ছড়া সুতোকাটা
বিলাসপুরের ঘুড়ি
একটা ছড়া ভর দুপুরের
হঠাৎ ইলশে গুঁড়ি।

গোলাপ
অঙ্কিতা আচার্য

শাখায় শাখায় ফুটলো গোলাপ
গাছটি করে আলো,
রূপের বাহার ছড়িয়ে দিল
দেখতে লাগে ভালো।

সময় এলে এই ছবিটি
খাতার পাতায় আঁকি,
মনটা কেমন করে তখন
নয়ন ভরে দেখি।

ঢাক বাজে রে
উপাসনা পুরকায়স্থ

মেঘের মিছিল আকাশ পথে
চলছে সারি সারি
খেলনা পুতুল সঙ্গে দেখি
একটি মোটর গাড়ি।

শিউলি ঝরা উঠোন বলে
তিন্নি বুবু কই
শুনছি কোথায় ঢাক বাজে রে
রাখ তুলে রাখ বই।

ডোবার ধারের কাশ ফুলেরা
বললে নেড়ে মাথা
পুজোর দিনে পাড়ার ভাবনা
এক্কেবারে যা-তা !

বানাচ্ছে মা রসগোল্লা
রান্নাঘরে বসে
ঠাম্মা বলে একটু রসো
ডুবিয়ে তো নিক রসে।

সাজছে দুগ্গা মণ্ডপেতে
হাওয়ায় ভাসে খুশি,
ঢাকের তালে নাচছে দেখি
বুবুর বেড়াল পুষি।

ফুল ফুটেছে
দীনেশচন্দ্র আচার্য

ফুল ফুটেছে অন্ধকারে
ফুল ফুটেছে নিঃঝুম রাতে
ফুল ফুটেছে চাঁদের আলোয়
নীল সবুজ এই ধরার ছাতে।

ফুল ফুটেছে সুবাস ভরে
গন্ধ দিতে মান ভাঙাতে,
ফুল ফুটেছে প্রাণ জুড়াতে
বিশ্বহৃদয় মন রাঙাতে।

ফুল ফুটেছে মাটির ঘরে
ফুল ফুটেছে গোবর কুঁড়ে
ফুল ফুটেছে দালান কোঠায়
ফুল ফুটেছে জগত জুড়ে।

ও পাখি
শীলা মুখোপাধ্যায়

ও পাখিরে ওই দুরে উড়ে উড়ে আকাশের গায়
সেথা যা রে মন যেন যেথায় হারায়।
আয় আয় তোকে দেব এত্তো আকাশ,
মেঘ কালো দেবো তোকে বরষার মাস।
আয় আয় তোকে দেব সোনা রোদ্দুর
উড়ে যাবি ঐ পারে চোখ যদ্দুর।
কথা শোন কেমন রে এমন অবুঝ,
আয় আছে তোর তরে অরণ্য সবুজ।
আছে আছে সব তোর ডানাতেই মোড়া
আকাশ আলো মাটি পৃথিবী জোড়া।
যেদিন ও পাখি তোর নেশা হবে ফিকে,
ফিরিস রে ঝাপটিয়ে ঘরের এদিকে।

শরতের উৎসবে
কাশীনাথ মোদক

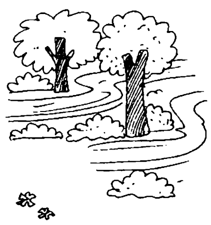

চল যাই দল বেঁধে
নদী ধারে
ফুটে আছে কাশ ফুল
সারে সারে।
পেঁজা পেঁজো সাদা মেঘ
ভেসে যায়
বাউলেরা আগমণি
গান গায়।
ভরা নদী ঢেউ তুলে
ছুটে চলে
ভ্রমরেরা মৃদু স্বরে
কথা বলে।
ঢাক বাজে ঢোল বাজে
খুশি সব
চারদিকে ছোটদের
কলরব।
শিউলির হাসি হাসি
মুখখানি
ভোরবেলা দেয় দেখি
হাতছানি।
এক হয়ে সকলের
হাত দুটি
শরতের উৎসবে
মেতে উঠি।

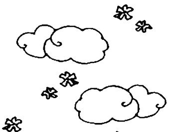

অটোমেটিক পেন
পার্থ সিনহা

বিজনবাবু সৃজনধর্মী কর্মে থাকেন মগ্ন
নিত্য নতুন আবিস্কার-ই তাঁর জীবনের স্বপ্ন।
এমনই এক সৃষ্টি নেশায় বর্তমানে লিপ্ত
যেমন গুণী মানুষ উনি, তেমন বুদ্ধিদীপ্ত !
গাঁট্টা খেয়ে যে সব ছেলে মাথায় লাগাস মলম
ফেল করা সে ছেলের জন্য বের করেছেন কলম !
প্রশ্ন যতই হোক না কঠিন ছুটবে না আর ঘাম
তরতরিয়ে উতরে যাবি সমস্ত এগজাম !
খাতার উপর কলম ধরে... উত্তেজিত হোসনে
অন করে দিস সুইচখানা চোখ বুলিয়ে প্রশ্নে !
অটোমেটিক চলবে কলম, থামবে না তার গতি
ভাববে টিচার ভর করেছে দেবী সরস্বতী !
কেমন করে লিখবে কলম ? একটু খবর নিবি -
ওই কলমেই ভরা আছে বুদ্ধি একুশ জিবি !

কোথায় পাবি কলমখানা ? চাইছে পেতে মন ?
এই কাগজেই দেখতে পাবি পেনের বিজ্ঞাপন !

এত মেঘে মেঘে আছি উদ্বেগে
প্রেমাঙ্কুর মালাকার

মেঘেরা করেছে আকাশ ঘেরাও,
নীলাকাশ গেছে ঢেকে,
কোন দাবী নিয়ে অবস্থানকে
ভাদ্রেও দিল রেখে ?

পুজোর বোনাস পায়নি এখনো
বরুণ দেবের কাছে ?
হয়েছে সময় যাবে মেঘালয়
কী হেতু আটকে আছে ?

শরৎ মানেই নীলচে আকাশ
হালকা মেঘের সাজ,
এ কেমন হল ? চাপ চাপ মেঘে
আকাশের কারুকাজ ।

পুরোটা ভাদ্র ঢাকলে আকাশ
এমন জমাট মেঘে,
পুজোর ক'দিন কাটবে কেমন ?
তাই ভাবি উদ্বেগে !

নদীর পাশে
বিকাশ পণ্ডিত

পুলের নীচে দাঁড়িয়ে আছি
পুলের 'পরে গাড়ি;
বইছে নদী আঁকন-বাঁকন
তার-ই পাশে বাড়ি।

নদীর জল ছলাৎ ছলাৎ
জেলের ডিঙা ভাসে,
বর্ষা এলে কদম ডালে
হাজার ফুল হাসে।

এই নদীতে আমার সাথে
[illegible] হরেক পাখি,
[illegible] আর ছাগলছানা
[illegible]-রিমা-রাখি।

নদীর ডাকে যাই ছুটে সব
[illegible] বাঁশি,
[illegible] হাওয়ায় ছড়িয়ে থাকে
[illegible] হাসি।

শরতে আজ
পঞ্চানন বসু মল্লিক

বর্ষার পর আকাশটা নীল
বুঝতে পারি মানে—
শরৎ এলো ফুলের মেলায়
শিউলি মেয়ের টানে।

গাঁয়ের মাঠে কাশের দোলা,
বাতাস সবুজ ধানে —
কনকচাঁপা রোদের হাসি
চারদিকে সবখানে।

শিউলি ঝরে বাগান জুড়ে
কাছে, দূরের পানে —
মন খুশিতে ভ'রে ওঠে
পদ্ম ফুলের ঘ্রাণে।

বাউল কন্ঠে দুর্গার গান
পুজোর খবর আনে —
শরতে আজ পুজোর খুশি
জাগে সবার প্রাণে।

রহস্য জটিল
কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এ জগতে কার মন কখন কী চায় —
গভীর সে রহস্য বুঝে ওঠা দায়।
কেউ চায় গোয়েন্দা, কেউ চায় ভূত
রোমাঞ্চ ছাড়া কারও মন খুঁত খুঁত।
কেউ চায় রূপকথা, কেউ চায় জঁর—
রক্ত চলকে ওঠা থ্রিলার-হরর।
কেউ চায় শিহরণে খাড়া হোক চুল,
কেউ অ্যাডভেঞ্চারে হবেই ব্যাকুল,
কেউ বা জীবনকথা, কেউ বা ভ্রমণ,
হাসির গল্পে কারও মেতে ওঠে মন।
কেউ বলে, পুরাণ বা উপকথা হোক,
কল্পবিজ্ঞানেও কারও কারও ঝোঁক,
কেউ চায় ধর্ম তো কেউ পরিবার
কেউ চায় সব ছেড়ে ঐতিহাসিক।
এই যে বিষয় এত নানান প্রকার,
লক্ষ লক্ষ আছে পাঠক যে তার
তবু কে যে কীসে খুশ, চিন্তায় তাই
তুলি হাই, ওরে ভাই, চোখে ঘুম নাই।

মুখ্য পরব
বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

মেলাতে ঐ ছেলেটি
কিনছে বেলুন, বাঁশি
মুখে তার ছলকে পড়ে
সকালের রোদের হাসি।
ছেঁড়া প্যান্ট তাপ্পিমারা
ঘাম ভিজা ঐ পিরাণে
মেলাতে বুটভাজা তাই
তাকে যে জোরসে টানে।
তার নেই কেউ কোথা যে
একলা ফুটপাতে তাই
সারাদিন ভিক্ষা করে
স্টেশনে রাতে ঘুমায়।
তবু নেই বিষাদ চোখে
বুকে নেই দুঃখ, গরব
বাঁচাটাই আসল মজা

জীবনের মুখ্য পরব।

ভুবনডাঙার মাঠে
সুচন্দ্রনাথ দাস

ছুটির দিনে আমরা ক'জন মন দিই না পাঠে,
খেলা করি, ছুটে বেড়াই ভুবনডাঙার মাঠে।

মাঠের ধারে গাছে গাছে অনেক রকম পাখি,
ডানা মেলে রোদের আবির করে মাখামাখি।

আকাশ থাকে অনেক দূরে, আমরা দেখি চেয়ে,
খুশির যে গান মনে আসে আমরা উঠি গেয়ে।

পানকৌড়ি দেখি ঝিলে দিচ্ছে কেমন ডুব
গাছের ডালে উঠে বসে মজা করি খুব।

পাড়ার ছেলে ভাইবন্ধু, মেয়েরা সব বোন,
শুভ্র আলোয় ঝিকিমিকি মনের সকল কোণ।

ইচ্ছে হলেই হাসিখেলা, দ্বন্দ্ব-বিভেদ মানা,
পাখির মতো দিই মেলে দিই খুশির দুটি ডানা।

বুড়োবুড়ি
শীলা সরকার

আদি কালের শিশুদের বৈদ্য-ঠাকুমা, দাদু
ছড়া শোনাতো পাশে শুয়ে, সেটাই ঘুমের যাদু।
শুনতো শিশু শুয়ে শুয়ে সুখেতে বুক ভরা
রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে রাজকন্যাকে ধরা।

পথে কত তরবারির ঝনঝনানি, বাধা
খোকা শুয়ে নিজেই ভাবে ঘুমপাড়ানি ধাঁধাঁ।
গল্প বলা মাসি-পিসি আছে কোথায় তারা ?
ঠাকুমা-দাদুর চোখেতে জল, সব পরিজন হারা।

কোথায় পাবে কাকা-কাকি, পিসি, মাসি-মেসো,
কেউ বলেনা এরা আপন, এদের ভালোবাসো।
ছেলে খোঁজে, দাদু-ঠাকুমা কোথায় তারা থাকে ?
বাবা বলেন – ওসব ছাড়ো, ডাকবো তোমার মাকে ?
ঠাকুমা-দাদুর ঠাঁই হয়েছে সিঁড়ি ঘরের তলে,
দাদু-দিদার গল্প বলা সবই গেছে জলে।

বড় হয়ে ওঠা
অচিন্ত্য সুরাল

[illegible] ভিতরে ইটের পাঁজর
[illegible]-ওখানে ভাঙা
[illegible] পেরিয়ে জলের চিহ্ন
[illegible] উপরে ডাঙা।

[illegible] তাকে হাতছানি দেয়..
[illegible] দেয় উঁকি
[illegible] ছড়িয়ে দিয়েছে
[illegible] কিবুকি।

[illegible] হবেই জানে,
[illegible] হবেই তাকে
[illegible] একফালি রোদ
[illegible], ডাকে।

[illegible] স্বপ্ন দেখে না,
[illegible] সাধ;
[illegible] পড়ার
[illegible]।

[illegible] তার আহ্লাদ
[illegible] টের
[illegible] বাড়ে
[illegible] রের।

[illegible] আবার
[illegible] ভিড়
[illegible] জন্য
[illegible]

[illegible]
[illegible] মণ্ডল

[illegible] আছে
[illegible]
[illegible] ধরেছে
[illegible] না।
[illegible] কিনা
[illegible]
[illegible] বুঝি
[illegible]

রঙিন খাম
সোমনাথ ভট্টাচার্য

ঝমর্ ঝমর্ রেলের গাড়ি
রাঙা মাটির গ্রাম
পাঠিয়ে দিল ডাক পিয়নের
হাতে রঙিন খাম।
দীঘল ডানায় উড়ছে পাখি
ডাকের টিকিট জুড়ে
হাওয়ার বাঁশি ডাক পাঠাল
দূরের থেকে দূরে।
পথের টানে এবার তবে
বেরিয়ে পড়ি চলো
বুক পকেটে ছুটির আকাশ
রৌদ্রে ঢলোঢলো।

চাঁদে ভূত
রূপালী গোস্বামী

চাঁদে বাড়ি করে
ভূতেরা সব যাবে চলে,
পৃথিবীর মায়া তারা
দেবে ছেড়ে অবহেলে।
সাজো সাজো চিৎকার
হৈ হৈ সারাক্ষণ,
চাঁদের ভূতপুরে
মজে আছে মনপ্রাণ।
টা টা গুড বাই ভাই
আর নয় পৃথিবীতে
চাঁদে বাড়ি করলে
ফিষ্টি হবে দারুণ শীতে।

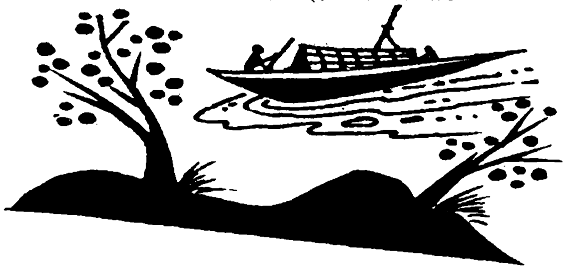

সব সত্যি
অনিরুদ্ধ ডাঙ্গুরিয়া

ডালিম গাছে হঠাৎ দেখি
কুমড়ো গাছের ফুল
সত্যি কথা বলছি শোনো
একটুও নয় ভুল।

মিথ্যে কথা বলছিনা ছাই
আমি কি আর হাঁদা ?
চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি
কাকগুলো সব সাদা।

চোখ রগড়ে, গা-চিমটে
অনেক করে দেখি,
গাছের উপর গরুবাছুর
ঝিমোয় বসে একি !

• মিথ্যে এসব কেন হবে
ঘটছে যা দিন দিন
বিদেশ থেকে আসছে উড়ে
প্লাস্টিকের ওই ডিম।

যেই এঁকেছি
সমীরণ দত্ত

রং তুলিতে যেই এঁকেছি
পাহাড়-ঝর্ণা-নদী,
পাহাড় ডাকে আয় ছুটে আয়
আমায় আঁকলে যদি।
সানরাইজে দেখতে পাবে
অলোকসুন্দর শোভা,
কখনও বা তুষারপাতের
দৃশ্য মনোলোভা।
যেই এঁকেছি একটা ঝর্ণা,
সারাক্ষণ স্রোতের গান,
চপল ছন্দে চলার পথে
শুনছে ঝিঁ-ঝির তান।
ডাক দিয়ে যায় ঝর্ণা যেন
আমার কাছে আয়রে,
ছড়ার গন্ধ ছড়ায় এমন
মনটা ছুঁয়ে যায়রে।

সিনেমা তৈরির গল্প

গত বৎসর লিখেছিলাম 'ছবি তৈরির অজানা গল্প'। সিনেমা বানাবার সময় কত রকম ফ্যাসাদে পড়তে হয়। বিশেষ করে আউটডোর শুটিঙে। পরিচালক ভাবেন এক পরে পরিস্থিতি বুঝে হয়তো অন্য কিছু ধরা দেয় ক্যামেরার লেন্সে। আবার আউটডোর মানে খোলা মাঠে শুটিং। কিন্তু খোলা মাঠের লোকেরা খোলা মনের হবেন এমন কোন কথা নেই।

সাল হবে ১৯৯৭। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হল। কলকাতা দূরদর্শন থেকে সৌভাগ্যক্রমে আমি একটা টিভি সিরিয়াল (মাত্র ১৪ পর্ব) বানানোর সুযোগ পেলাম। সেই উপলক্ষে তৎকালীন কিশোর ভারতী পত্রিকার সম্পাদক দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি 'নীলঘূর্ণি'। ঐতিহাসিক গল্প। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের গল্প। সব মিলিয়ে জমজমাট। ঠিক করলাম জর্জ বেকার কে নেব নীলকর সাহেবের চরিত্রে। বেশ মানিয়ে যাবে। গল্পের প্রয়োজনে দরকার হয়ে পড়ল জঙ্গলের ভেতর একটা জরাজীর্ণ বাড়ি। যেখানে নীল চাষিদের আন্দোলন সংগঠিত হবে। প্রডাকশনের একটা ছেলে বলল - স্যার বজবজের দিকে ঐ রকম একটা বাড়ি আছে। যাবেন নাকি দেখতে ? কলকাতার কাছেই বজবজ। ট্রেনে চেপে গেলাম তার সাথে। ষ্টেশনে নেমে রিক্সা করে মাটির রাস্তা দিয়ে এগোতে লাগলাম। বেশ এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। তবে রিক্সাওয়ালাটি বেশ ভালো। বলছিল- বাবু, আপনারা শহর থেকে গাঁয়ে এয়েচেন। না জানি কত কষ্ট হচ্ছে।

প্রায় আধ ঘন্টা বাদে পৌঁছালাম অকুস্থলে। চারিপাশে বড় বড় গাছ গাছালি। মাঝে সেই জরাজীর্ণ বাড়িটি। নীচে কয়েক ঘর অধিবাসী। আমি এক পলকেই পছন্দ করে ফেললাম বাড়িটি।

বাড়ির যারা অধিবাসী তারাও নিতান্তই দরিদ্র। কিন্তু শুটিং হবে জেনে মহা খুশি। আমাকে বাড়ির ভিতর আপ্যায়িত করলেন। তখনই কালো মতন এক ষণ্ডা গোছের ভদ্রলোকের দেখা।

আমাকে এক পলক দেখে বললেন, কী চাই এখানে ?

নীলঘূর্ণির আদিপর্ব

প্রণব হোড়

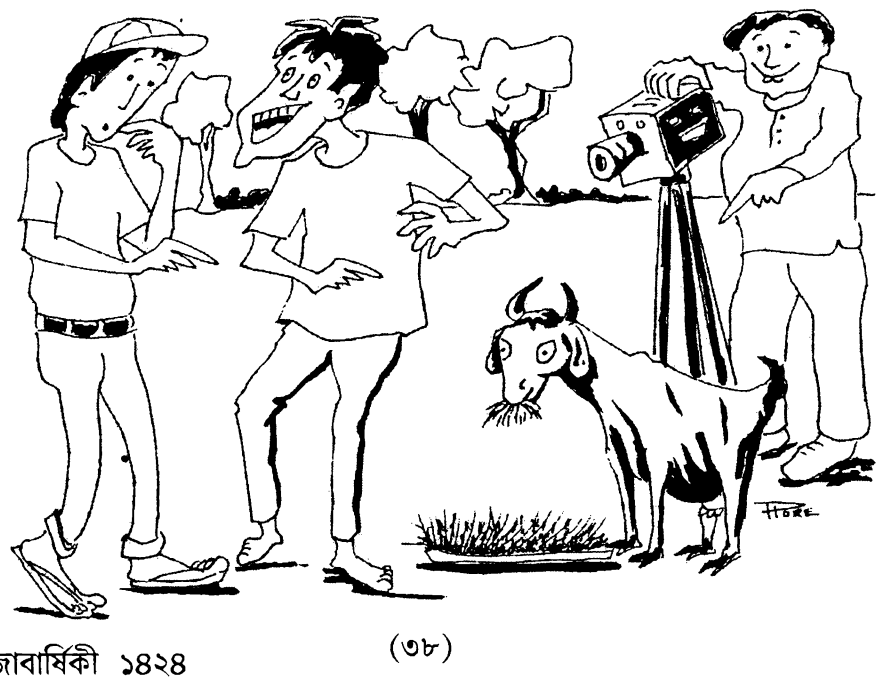

[illegible]র সাথে বললাম, সিরিয়াল শুটিং করতে চাই।

তিনি বেশ ঝাঁঝিয়ে বললেন - পাড়ার ক্লাবে এসে কথা বলে তবে এখানে আসবেন। তিনি প্রস্থান করলেন।

ব্যাপারটা অনুধাবন করার আগেই মলিন ধুতি পাঞ্জাবি পরা কৃশকায় এক ব্যাক্তি হাজির। বললেন আপনাকে ঘেঁটু কী বলে গেল ?

বললাম- ঘেঁটু কে ?

ঐ যে মোটকাটা। যেটা কথা বলে গেল।

বললাম – ও উনি, উনি তো দারুণ মানুষ।

বললেন শুটিঙের আগে ক্লাবে গিয়ে কথা বলে আসতে।

ভদ্রলোক চিবুকে হাত দিয়ে দুইবার বটে বটে বলে [illegible] পায়চারি করলেন। তারপর আমার কাঁধ চাপড়ে বললেন, ওদের ক্লাবে নয়। আপনি আমাদের ক্লাবে আসুন। [illegible] কিছু দিয়ে দেবেন। তারপর শুটিং করবেন।

তিনি চলে গেলেন। বেশ ফাঁপরে পড়লাম। [illegible] বাড়ির অধিবাসীদের বলি, এটা তো আপনাদের [illegible] বাইরের লোকে এসে অনুমতি দেবে কেন ? [illegible] টাকা নিন, সেটাই নিয়ম।

সেই সুযোগ পেলাম না। সাইকেলে করে তিনজন [illegible] এসে হাজির। বলল – ও দাদা, ঐ শুটকোটা কী বলে [illegible] কিচ্ছু না। আপনি আমাদের ক্লাবে যা দেওয়ার [illegible] বন্দোবস্ত করে নেবেন। আমরাই সব। আমাদের [illegible] তো ?

বললাম ঘেঁটুদার ক্লাব ? চমকে উঠলো [illegible] ও ! তবে ওটাও এসেছিল ? আপনি একদম [illegible] পড়বেন না। ওর কোন ক্ষমতা নেই। এখানে [illegible] ক্ষমতা।

কাচুমাচু মুখে বাড়িটার থেকে বেরিয়ে রিক্সায় [illegible] ফিরতি মুখে রাস্তায় আরো একজন ধরলেন। তিনি [illegible] প্রায় পথ অবরোধ করে দাঁড়ালেন। বেশ [illegible] বললেন - আপনারা এদিকে কোথায় এসেছিলেন ?

[illegible] রিস্কা থেকে সব জানালাম। ভদ্রলোক পার্শ [illegible] ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বললেন, সবার আগে [illegible] সাথে দেখা করবেন। আমি কাউন্সিলারের [illegible]

[illegible] নমস্কার জানিয়ে রিক্সাওয়ালাকে বললাম, [illegible] ট্রেন ধরতে হবে।

স্টেশনে নেমে ভাড়া মিটিয়ে পেছন ফিরতে যাবো। [illegible] যাকে বেশ ভদ্র- বিনয়ী-ভালোমানুষ ঠেক ছিল [illegible] যেন কর্কশ কন্ঠে বলল, বাবু, একটা কথা [illegible]

কী কথা ? পেছন ফিরলাম।

আপনারা কি এখানে শুটিং করবেন ?

বললাম চিন্তা করে দেখি।

[illegible] জানাল, তা'লে শোনেন। এলে কোথাও কারো কাছে যাওয়ার দরকার নেই। রিক্সাস্ট্যান্ডে আসবেন। আমাদের নেতা হরিপদ যা দেওয়ার তাকে দেবেন। আমরা রিক্সাওয়ালারা আপনাদের গার্ড দেব। কেউ কিস্যু করতে পারবে না। এখানে আমরাই সব।

বলাই বাহুল্য হরিপদর ঘরে আমরা আর পদধূলি দিইনি। শুটিং করেছি অন্যত্র। সেট করে।

আরো একটা ঘটনা ঘটে ঐ সিরিয়াল বানাতে গিয়ে। একটা দৃশ্য ছিল একজন বিদ্রোহী কৃষকের মাথায় পলিমাটি ঢেলে যেখানে নীলচাষ করে নীলকর সাহেবরা গ্রামে ঘোরাচ্ছে তাকে। উদ্দেশ্য ঐ শাস্তি দেখে কারোর যেন বিদ্রোহ করবার ইচ্ছা না জাগে। চিন্তায় পড়লাম। কীভাবে তৈরি করব দৃশ্যটি। ঠিক করলাম বড় একটা থালায় মোটা করে তুলো বিছিয়ে তাতে কাদা জল ঢেলে ছোলা মটরের বীজ ছড়িয়ে দেব। দিন দশেক পর বেশ বড় বড় চারা বের হবে। তখন সেটা কোন এক অভিনেতাকে কৃষক সাজিয়ে মাথায় তুলোর টুপি পরিয়ে গ্রামে ঘোরালেই হবে। দর্শক চমকে উঠবেন এমন দৃশ্য দেখে। টি আর পি পাবে আমার সিরিয়ালের।

তাই করা হল। চারা বের হল। থালায় করে মহাযত্নে শুটিং স্পটে নিয়ে যাওয়া হল চারাগাছ। ঐ শর্টটি টেক করা হবে দুপুরে। গাছের তলায় আমার সহকারী এন্টনি পাহারা দিচ্ছে থালা। মাঝে মাঝে জল দিচ্ছে। একজন অভিনেতাকে ইতিমধ্যে কৃষক সাজানো হয়েছে। তার মাথায় পরানো হবে তুলোর আচ্ছাদনটি। হঠাৎ হাউমাউ করে ছুটে এলো অন্টনি স্যার সর্বনাশ।

কী হয়েছে ?

ছাগলে থালা থেকে তুলো সুদ্ধ চারাগাছ সব খেয়ে নিয়ে গেছে। কী হবে স্যার ?

দুঃখটি আজও আমার যায়নি। সময়টা তবে এখন হলে কম্পিউটারের মাধ্যমে অনায়াসে মাথায় কৃত্রিমভাবে চারাগাছ লাগিয়ে দিতে পারতাম। তখন পারিনি। কুড়ি বছর আগে প্রযুক্তি এত উন্নত ছিল না।

আফশোষ হয়।

স্বদেশ

রামচন্দ্র ধাড়া

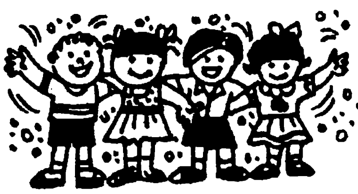

দেশ মানে শুধু নদী-গিরি নয়, নয় অরণ্য-মাটি,
তিনি সকলের অন্নদায়িনী-স্বদেশ জননী খাঁটি।
তিনি দিয়েছেন সবে আশ্রয়,
দূর করেছেন মন থেকে ভয়,
জীবন যুদ্ধে তাঁর অবদান অতিশয় পরিপাটি।

শহরে
বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস

শহরে – গাছ নাই, পাখি নাই
বাড়ি ঘর হাই ফাই
ছুঁতে চায় স্কাইটাই।
বসবার ভাববার
সময়টা হাতে নাই
বাড়ে কাজ বাজে সাজ
আর কপালেতে ভাঁজ
বহরে।
শহরে– জনতার নামে ঢল
রব করে কলকল
রাতে আলো ঝলমল
বাড়ে হল আর মল
কমে খেলা মাঠে ছোটা
এটা সবচেয়ে দুর্বি—
সহরে।
শহরে –বেশি বেশি গাছ এসে
পাখিদের নাচ এসে
ভরাবে কী জীবনের
আধ-ভরা থালাটাই
কহ রে।

কোমল গানের সুরে
নুরজামান শাহ

শেষ বিকেলের লাজুক রোদের
উঠলো ফুটে হাসি,
মিষ্টি মধুর ওই হাসিটা বড়ই
ভালোবাসি।
একমুঠো রোদ নিলাম হাতে
ছড়িয়ে দিলাম দূরে,
দেবদারু বন দাপাই দেখি
কোমল গানের সুরে।
ঝর্ণা থেকে সমুদ্দুর আর
বাতাসে যাই ভেসে,
হাতছানি দেয় ঝিরঝিরানি
শামিয়ানার দেশে।
সে দেশেতে স্বপ্ন আছে
পথ আছে তার খোলা,
একলা হলেও মনের মাঝে
আনন্দ দেয় দোলা।

ছটফটে মন
কাজী শাহাদাত আলি

ছটফটে মন ছোটে
ওই দূর আকাশে,
ভেসে ভেসে মিশে যায়
সমীরণ বাতাসে।
কভু হাঁটে চাঁদ হয়ে
নীল ভরা মুকুরে
সূর্যের ধূপছায়া
মাখামাখি দুকুরে।
মাঠঘাট পার হয়ে
সবুজের মেলাতে,
হেসে ওঠে মেতে ওঠে
নব নব খেলাতে।
নদী হয়ে ছোটে কভু
খুশি ভরা চিত্ত,
আরও কত কী যে মন
করে চলে নিত্য।

নিজের কাজ
রাজীব মিত্র

স্যার বললেন, “তোমরা ছোট
যে যার মতো করে,
নিজের নিজের কাজ করলে
মনটা যাবে ভরে।
যেমন ধরো বইপত্তর
পড়ার শেষে তুলে
গুছিয়ে রেখো রুটিন মেনে
যেও না মোটে ভুলে।
ব্রাশ করবে মাজন দিয়ে
সকালে আর রাতে,
রোগ জীবানু তবে বাসা
বাঁধবে না আর দাঁতে।
ছোট খাটো এমন কত
কাজ রয়েছে আরো,
বাড়িতে কেউ করলে কিছু
বলতে আমায় পারো।”
“আমি করি” বললে বলাই
বসে বেঞ্চের কোণে
“সুযোগ পেলেই সেলফি তুলে
ফেলছি বাবার ফোন।”

ঘোচায় সকল ব্যথারে
রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক

বাংলা আমার মুখের কথা
প্রাণ জুড়ানো সুখের কথা
ব্যথা শোকের দুখের কথা
তৃপ্ত হাসির বুকের কথা
রূপকথার কথারে
ঘোচায় সকল ব্যথারে।

বাংলা আমার মায়ের কথা
ছোট বোন আর ভায়ের কথা
শহর নগর গাঁয়ের কথা
ডাঁয়ের এবং বাঁয়ের কথা
এপার ওপার কথারে
ঘোচায় সকল ব্যথারে।

বাংলা আমার শিশির কথা
জ্যোৎস্না ভেজা নিশার কথা
মা মাসি আর পিসির কথা
সাতটি তারা ঋষির কথা
পুরাণ কথকতারে
ঘোচায় সকল ব্যথারে।

বাংলা আমার ভালোর কথা
কালো হরণ আলোর কথা
দীপ্ত আলো জ্বালোর কথা
গানের সুর ঢালোর কথা
আউল বাউল কথারে
ঘোচায় সকল ব্যথারে।

খুচরো ছড়া
সুকান্ত ঘোষ

গ্রীষ্মকাল এসে গেছে
ফল খেয়ে যা রসালো
এই না বলে তাডুকাকা
দাওয়াতে তার বসালো।
আম জাম আর এনে লিচু
পাতে আমার দিয়ে কিছু
বলল খেয়ে সুখ পাবি
ফলগুলো সব শাঁসালো।
কাল বিকেলে বৈশাখী ঝড়
বোঁটা থেকে খসালো।

ঝোঁক
সুমন বিশ্বাস

ঝোঁক তার দাবা খেলায়
ঝোঁক ফুটবলে,
ক্রিকেটেও নাম ডাক
অভ্যাসের ফলে।

টেবিল টেনিসে তার
দেশ জুড়ে ডাক,
খেলা পাগল ছেলেটির
নেই কোন জাঁক।

কবাডি বা খো খো খেলায়
বেশ খ্যাতি রাখে,
নাওয়া খাওয়া ভুলে ছেলে
মাঠে পড়ে থাকে।

অজগাঁয়ে বাস ছেলের
নাম ভোলানাথ,
খেলোয়াড় হয়ে সেতো
করে বাজিমাত।

[illegible] খেলোয়াড় ভোলা
নাম দিকে দিকে
[illegible] পদক পেল
[illegible] অলিম্পিকে।

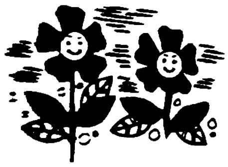

স্বপ্ন
[illegible]েন্দ্রনাথ ধর

[illegible] হত গাছ তার
[illegible] হত ফল
[illegible] শরীরে জল
[illegible] টলটল।
[illegible] কিলবিল
[illegible] পোনা,
[illegible] ফলবেই
[illegible] সোনা।

ইছিল বিছিল
তারাশঙ্কর চক্রবর্তী

ইছিল বিছিল মেঘের মিছিল
কী চিল ওড়ে দূরে ?
গাঙচিল নাকি শঙ্খ চিলের
চ্যাঙ ভাসে চিৎপুরে।

চিৎপুরে চিল উড়ছে কত
কিৎ-কিৎ চু - খেলা
ভাসছে জলে নৌকো নিয়ে
হাসছে সকালবেলা।

শিম লতানো এই যে পাতা
হিম মেখেছে শীতে
গলসি গাঁয়ের ছোট্ট মাসি
কলসি কাঁখে নিতে —

আসছে পথে জল নিতে জল
থাসছে পিসি ময়দা
বুট পরে পায় তিন-তিনটা
ফুটবলে গোল জয়দা।

গোল দিয়ে গোল জিতল গাঁয়ে
মোলবাগানের মাঠে
শোল মাঠে ওই লাফায় জলে
পোল ভেঙে যায় হাটে।

লেজুড় হল হাঁদার দাদা
খেজুর চিটা গুড়ে
খাচ্ছে পিঠে হাপুস হুপুস
নাচছে তেড়ে ফুঁড়ে।

বিস্ময়ে চেয়ে থাকি
সঞ্জয় কর্মকার

পাখিদের কথা পাখিরাই জানে —
আমরা কী তার জানি !
বাবুই কেমন কৌশল করে
বানায় যে বাসাখানি।

সেকথা আমরা বুঝব কেমনে ?
আমরা কী আর পাখি,
আমরা তো শুধু বাসাখানি দেখে
বিস্ময়ে চেয়ে থাকি !

ইচ্ছে করে
মেধস ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবাও নাকি ছোট্ট ছিল, দুষ্টু ছিল ভারী
দিনমান সে টো টো করে ঘুরত বাড়ি বাড়ি।
একদিন তো আমের গাছে যেই ছুড়েছে ঢিল,
অমনি তেড়ে এল মালি, পড়ল পিঠে কিল।
রোজই হত সুরো পিসির কুলের আচার চুরি
এ সব কাজে আমার বাবার ছিল না তো জুড়ি।
খেলার মাঠটা প্রিয় ছিল বাবার কাছে খুব
ফিরত বাড়ি ঘেমে নেয়ে, সূয্যি দিত ডুব।
পড়তে বসে সন্ধ্যেবেলায় নামত চোখে ঘুম
বাবার ঠামি কপালে তার দিত স্নেহের চুম।
দাদুর কাছে শুনতো বাবা রামায়ণের গল্প
পড়ার চাপটা তখন ছিল এক্কেবারেই অল্প।
আমার ভীষণ ইচ্ছে করে সেদিন গুলোয় যেতে
কাটিত কেমন দিনগুলো সব মজার খেলায় মেতে।
কিন্তু আমার সময় কোথায় ? পাচ্ছি কোথায় ফাঁক ?
বিকেল হলেও সাদা খাতায় চলছি কষে আঁক।

শারদ খুশি
গৌতম বিশ্বাস

সোনা রোদের ঢল নেমেছে চাদ্দিকেতে জোর,
আর কতক্ষণ থাকবি শুয়ে এবার তো খোল দোর।
বর্ষা শেষের ফর্সা আকাশ ঘিরেছে দ্যাখ নীলে,
পদ্ম শালুক ফুটলো কত জল থৈ থৈ বিলে।
শিশির ভেজা শিউলি ফুলে ভরেছে গাছ তলা,
দুব্বো ঘাসের আগায় আগায় হাজার মানিক জ্বলা।
ঢ্যাম কুড়া কুড় পড়লো কাঠি ঢাকেতে শোন ওই,
কে যেন ওই খুশির চোটে জুড়েছে হৈ চৈ।
খালের ধারে দেখে এলাম খুব ফুটেছে কাশ,
পুজো তো ফের এসেই গেল হয়তো বা একমাস।

নভেম্বর মাসের শীতের সন্ধ্যেটা নামতে তখনও কিছুটা দেরি। গরুমারা ন্যাশানাল পার্কের রাইনো-পয়েন্ট ওয়াচ টাওয়ারের কাছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের শিক্ষিত হাতি শান্তিপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জংলি হাতি গুণ্ডার।

আসলে হয়েছে কী , গুণ্ডাদের বিয়াল্লিশ জনের দলটা ফিরছিল লাটাগুড়ি জঙ্গলের ওপার থেকে, যাচ্ছিল মূর্তিনদীর দিকে। গুণ্ডা একটু পিছিয়ে পড়েছিল হেলে দুলে হাঁটতে। আর রাইনো-পয়েন্টের সামনের রাস্তাটা পার হওয়ার ঠিক আগে তিন-তিনটে ট্যুরিস্টের গাড়ি এসে পড়ল !

এই টুরিস্টগুলোকে নিয়ে হয়েছে গুণ্ডাদের মহা সমস্যা। এরা কাছ থেকে জংলী জানোয়ার দেখতেও আসবে, আবার গুণ্ডারা বিরক্ত হয়ে একটু তেড়ে গেলে ভয় পাবে, তার ওপর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে রিপোর্টও করবে। কে আর শুধু শুধু বদনাম কুড়োতে চায় ? তাই ওরা যতটা সম্ভব টুরিস্টদের এড়িয়ে চলে।

তা টুরিস্টগুলো চলে যাওয়ার পর, চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গুণ্ডা মূর্তি নদীর দিকে হাঁটা দিল। আর ঐ রাইনো-পয়েন্টের সামনের রাস্তাটা পার হওয়ার সময় গুণ্ডার বাঁ চোখটা চলে গেল শান্তিপ্রসাদের দিকে। মোটা মোটা লোহার শিকলে বাঁধা শান্তিপ্রসাদের চোখদুটো কেমন যেন ছল্ ছল্ করছে মনে হল গুণ্ডার। নামে গুণ্ডা হলে কী হবে, আসলে ওর মনটা খুব নরম। কারো চোখে জল দেখলে ও আবার স্থির থাকতে পারেনা। বছর তিনেক আগে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের ঘটনাটা কাগজে ছাপার পর তো গুণ্ডার কীর্তির কথা সবাই জেনে গেছে। সেবার ওদের দলের সামনে পড়ে গিয়েছিল একদল গ্রামবাসী। সবাই পালিয়ে গেলেও এ অথর্ব বৃদ্ধ পড়ে গিয়েছিল। গুণ্ডা সারারাত তাকে আগলে রেখে, ভোর হতে তবেই সেখান থেকে জঙ্গলে ফিরেছিল।

"কী শান্তিদা, কোমন আছ ? খবর-টবর কী ?"

"আর খবর। খবর তো তোরাই " – শান্তিপ্রসাদ যেন ঝেঁঝে ওঠে।

"মানে ?"– গুন্ডা অবাক।

— "আবার মানে বোঝাতে হবে ? আজ কুসুমডাঙার ধানক্ষেত, তো কাল কালুমল্লিকের কলাবাগান, আবার পরশু ভুটিয়াবস্তি লন্ডভন্ড। তোদের জ্বালায় একটু নিশ্চিন্তে থাকার উপায় আছে ? তোরা করবি গন্ডগোল আর আমাদের দৌড়তে হয় তোদের সামলাতে।"

গুন্ডা বুঝল শান্তিদা মোটেই শান্তিতে নেই। বেজায় চটে আছে ওদের ওপর। তাই ওর শান্তিদাকে শান্ত করার জন্য বলল, "তুমি আর কী বুঝবে আমাদের দুঃখু ? এ জঙ্গল থেকে সে জঙ্গল, এ রাজ্য থেকে ও রাজ্য। খালি তাড়া খেয়ে বেড়াই। নামেই অভয়ারণ্য। কত বড় শুঁড় ছাপানো নাম !! কিন্তু সত্যি কোনো সিকিউরিটি আছে বলতো ? চোরাশিকারীদের

শান্তিতে নেই শান্তিপ্রসাদ

সুমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

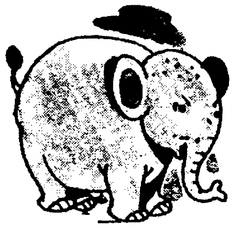

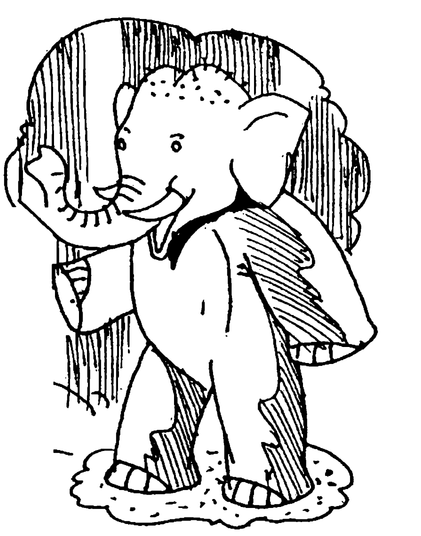

ইস্পাত তো লেগেই আছে " গুন্ডা জোরালো যুক্তি পেশ করে

এসব শুনে শুঁড় নেড়ে শান্তিপ্রসাদ বলে ওঠে, "তাহলে নিরীহ মানুষের ওপর হামলা করিস কেন ? কেন ওদের শস্য নষ্ট করিস ?"

"বা রে, সব দোষ আমাদের ? তুমি দেখছি গভর্নমেন্ট সার্ভিস পাবার পর থেকে একেবারে পাল্টে গেছ। একবারও তো ভাবলেনা কেন ওরা আমাদের জঙ্গল কেটে সাফ করতে গেল ? কেন আমাদের জায়গা জবর দখল করে ঘরবাড়ি বানাতে গেল ?"

শান্তিপ্রসাদ মাথা আর দু-কান নেড়ে বলে ওঠে, "তুই ব্যাটা জংলি। কোনো খবর রাখিস না। জনসংখ্যা কী হারে বেড়েছে জানিস ? আরো বেশি করে খাদ্য আর থাকার জায়গা চাই না ?"

—"বাঃ বাঃ, ভাল বললে দাদা, আমাদের জঙ্গল সাফ করে ওরা নিজেদের থাকার জায়গা বানাবে আর আমাদের জায়গা যে কমে যাচ্ছে দিনকে দিন ? আমরা তো আর মানুষের মতো জঙ্গলে মাল্টিস্টোরেড বানাতে পারবো না আর ঐ পায়রার খোপে আমাদের পোষাবেও না। হুঁ বাবা।"

"সে তোদের সমস্যা তোদেরকেই সমাধান করতে হবে" শান্তিপ্রসাদ মরামর্শ দেয়, "তোরা তো একটা মিছিল-মিটিং বা জয়েন্টপিটিশন দিতে পারিস।"

গুন্ডা বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, "তুমি তো বলেই খালাস ওসব অরগানাইজ করবে কে ? আসলে তোমার মাস ফুরোলেই গভর্নমেন্টের মোটা মাইনে আর রিটায়ার করলেই পেনশন্। তোমার আর কীসের টেনসান ?"

—"তা ঠিক রে, কিন্তু কী জানিস গুন্ডা", গুন্ডাকে শান্ত করতে বলে শান্তি, "যতই ফিউচার ব্রাইট হোক, আমাদের প্রেজেন্টটা বড়ই প্যাথেটিক। বড্ড খাটনি রে। দিন নেই রাত নেই ডিপার্টমেন্টের ডাক পড়লেই ছোটো। কোনো ছুটিছাটার বালাই নেই। বড্ড রুটিন মাফিক জীবন। মাঝে মাঝে তোদের দেখে বড় হিংসে হয় রে। তোরা কেমন ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াস। কত মজা করিস নিজেরা। দূর, কেন যে ছাই টেস্টের সময় বেগড়বাই করলাম না। তাহলে স্যার আমাকে সিলেক্ট করতে পারতেন না।"

গুন্ডা ওর শান্তিদার মনকষ্টের কথা শুনে বলে ওঠে, "অত একথা বললে চলবে ? গভর্নমেন্ট সার্ভিস পেয়ে তবে না তুমি 'কুনকি-রত্ন' মেডেলটা পেলে। তুমি তো আমাদের গর্ব"

—"তা ঠিক", শান্তি মাথা নাড়ে, "তবুও নিজের মতো করে বাঁচতে পারছি কই ?"

—"যাক গে, বাদ দাও ওসব কথা, বলি এই জন্যেই বুঝি ভর সন্ধেবেলা তোমার চোখে জল ?"

—"আরে না না। চোখে ঠান্ডা লেগেগে জল কাটছে। সেই দুপুরবেলা অয়েন্টমেন্টটা লাগানোর কথা ছিল। ইদ্রিশ চ্যাংড়াটা সেই যে গেছে ওষুধ আনতে, এখনো ফেরার নাম নেই। বড় আড্ডাবাজ। তবে হয়তো মালবাজারে পায়নি, শিলিগুড়ি গেছে মনে হয়।"

—"ও হরি ! তাই বলো। যাকগে, কথায় কথায় অনেক লেট হয়ে গেল। ওরা এতক্ষণে মূর্তিতে নেমে পড়ে ভালই মজা করছে", এই বলে গুন্ডা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় মূর্তিনদীর দিকে আর যেতে যেতে ওর লেজটা নাড়তে নাড়তে বলে ওঠে, "টা টা শান্তিদা, বাই বাই।"

আর অমনি শান্তিপ্রসাদ শুঁড় তুলে বলে, "ওকে, গুড নাইট, সময় পেলে আবার আসিস ভাই।"

'গরুমারা জঙ্গলে' ততক্ষনে সন্ধ্যে নেমে গেছে।

অ সুখে সুখ
স্বপন চক্রবর্তী

পাঁচ বছরের ছোট্ট খোকা, বলছে মা-কে ডেকে
'রোজ কোথা যাও ভোর না হতেই আমায় ফেলে রেখে'
উত্তরে তার মা বলে - শোন এটা আমার কাজ
এর জন্যেই মন সঁপেছি ছেড়ে সকল লাজ।
ছোটবেলায় তোর বাপি যে, হারিয়ে গেল কোথায়
মন মানে না, তাইতো আজও খুঁজছি হেথায় হোথায় !
খোঁজার ফাঁকেই বাড়ি বাড়ি জিনিস ফেরি করি
না যদি যাই, কেমন করে আসবে টাকা-কড়ি
তোর জন্যই আমার বাঁচা তুই যে নয়নমনি
কবে যে তুই বড় হবি সেই সুখে দিন গনি।
বড় যেদিন হবি রে তুই চাকরি পাবি খাসা
সেদিন থেকেই আমার ছুটি পূরবে মনের আশা।

কলুর বলদ
সোমনাথ চক্রবর্তী

কলুর বলদ ঘোরায় ঘানি দু'চোখ ঢাকা ঠুসি,
অবাক চোখে দেখছে চেয়ে খুকুর মেনিপুষি।
দাঁড়িয়ে আছে খদ্দেররা কিনবে ঘানির তেল,
মাঠের ধারে, খড়ের চালায় ধপাস পড়ে বেল।
পাশেই পুকুর-নোংরা জলে ধরছে জেলে মাছ,
কলুর ঘানি ঘুরছে তখন ক্যাঁচর-ক্যাঁচর-ক্যাঁচ।
মাছের তেলেও মাছ ভাজা হয় তেলের কত দাম !
ভিক্ষে করেও, তেল কিনে নেয় রুগ্ন-ঢ্যাঙা রাম।
মাঠের ঘাসে ফড়িং লাফায় বুনোফুলের ঘ্রাণ,
গাঁয়ের পথে যাচ্ছি হেঁটে পেলাম সুখের টান।

নাটক

মূল চরিত্র

গজেন দাদু ।। পুঁটি (গজেনদাদুর দশ বছরের নাতনি)।।
দারোয়ান গোলাম সিং।। ১ম, ২য়, ৩য় ও অন্যান্য ভূত।। ঘন্টু
কাপালিক।। প্রথম সহযোগী।। ২য় সহযোগী।।

গ্রামবাসী

প্রাণগোবিন্দ।। বিষ্টুপদ।। অঘোর।। কৃষ্ণকান্ত

প্রথম দৃশ্য

শেষ বিকেল। বাইরে পাখির ডাক। কুকুরের চিৎকার। দিবানিদ্রা সেরে গজেন দাদু উঠে দেখেন তাঁর চশমা খানা নেই। শুরু হয় তাঁর চিৎকার...

গজেনদাদু- পুঁটি আরে ও পুঁটি আমার চশমাখানা কোথায় রাখলি বল দিকি ছুঁড়ি...! (সাড়া না পেয়ে) পুঁটি আরে ও পুঁটি ই ই ই... (ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে..) কী গেরো রে বাবা! আমি যে মল্লাম... কতবার এদের বলিচি আমার চশমাখানা তোরা ছুঁবিনি.. তোরা ছুঁবিনি..তা যত জ্বালা সেই চশমাখানায় ? এ কী জয়নগরের মোয়া রে বাপু! পুঁটি! অরে ও হাড় জ্বালানি মেয়ে!

পুঁটি- (ঘরে ঢুকতে ঢুকতে) কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে শুনি... এমন চিল্লে চিল্লে লঙ্কাভাজা হচ্ছ অ্যাঁ! কী হয়েছে তোমার ও বুড়ো! কী চাই শুনি ?

গজেনদাদু- (কোমল গলায়) এই যে পুঁটি মা, এয়েচিস ? তোরে দু-দন্ড না দেখে যে আমার পরানডা আর রয় না...

গজেন দাদুর চশমা

শুভজিৎ বরকন্দাজ

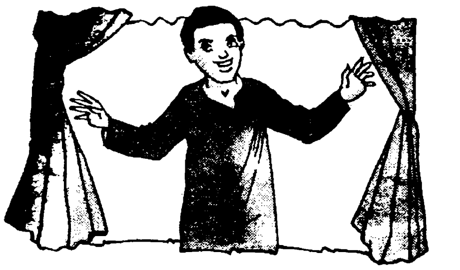

পুঁটি- (মুখ ভেংচে)... পরানডা আর রয় না... অ্যাঁ পিরিত কত !

গজেনদাদু- (পুঁটির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে) বল মা শিগগির বল, আমার চশমাখানা কোথায় রেখেছিস বল ! চশমাছাড়া যে আমি হলুম গিয়ে পানি ছাড়া কইমাছ ! ছটফটিয়ে মরি রে... তুই কি তা বুঝিসনি... দে মা দে... আমার সোনা পুঁটি.. সোনা পুঁটি...

পুঁটি- অ্যাঁ..ছোনা পুঁটি..! (চেঁচিয়ে) তোমার চশমা কোথায় আমি কী জানি ! ছোনা পুঁটি ! বুড়োর কত আহ্লাদ !

গজেনদাদু- কী বললি, বাদ দেব ? বাদ দেব কেন রে ! ও জিনিসখান বাদ দিলে কি চলে রে ! ও হল গে আমার শরীরটির সলতে.. ও কি বাদ দিলে চলে মা...

পুঁটি- কী জ্বালা রে জ্বালা ! কালা বুড়োর পাল্লায় পড়ে আমার জীবনখানা গেল রে উফ ! আমি বল্লাম আহ্লাদ.. বুড়ো শুনল বাদ ! (কানের কাছে গিয়ে চিল্লে) তোমার চশমা কোথায় আমি কী জানি !

গজেনদাদু- (কান ঢেকে) কী, এট্টুখানি ? ও তা ভালোই তো ভালোই তো.. দাদুর চশমা বলে কতা ! তা তোমার একটুখানি পরার শখ তো হতেই পারে..! এট্টুখানি পরবা তুমি একটুখানি পরব আমি... এ তো ভালো কথা.. এখন দে দেখি...!

পুঁটি- (কথা কেড়ে নিয়ে) উফ ! জ্বালাতন ! জ্বালাতন ! (দাদুর দিকে তাকিয়ে, স্বগতঃ) এখন এই কালাবুড়োর চশমা আমি কোথায় পাই ! সে তো খেলতে খেলতে কোথায় যে রেখেছি... মনেই পড়ছে না। কিন্তু এখন যদি বুড়োকে বলি আমিই চশমাটা হারিয়েছি, বুড়ো আমাকে চোর ডাকু বানিয়ে দেবে। তার চেয়ে বলি, আমি জানি না বস্।

গজেনদাদু- ও পুঁটি আমার যে গাবতলার গোবিন্দর চায়ের আড্ডায় যাওয়ার সময় হয়ে গেল রে। দে, চশমাখানা দে দে

পুঁটি- (কানের কাছে গিয়ে) আমি জানি না যাও তো (বিরক্তি দেখিয়ে প্রস্থান)

গজেনদাদু- এ কী গেরোয় পল্লাম বলো দিকিনি !বাড়িতে এমন একটা প্রাণী নেই, যার আমার উপর বিন্দুমাত্র দরদ আছে এখন এদিকে সন্ধে নামছে। গাবতলার আড্ডায় না গেলে পেটও আবার খোলসা হয়না ! কী জ্বালাতন ! আজ কী তবে চশমাছাড়াই পথে নামতি হবে ! কী জ্বালাতন ! কী জ্বালাতন

দৃশ্যঃ ২

ভর সন্ধেবেলা ক্যাওড়াতলায় ভূতের আড্ডা জমেছে। [illegible] ভূত অদ্ভুত একটা জিনিস (চশমা) নিয়ে তার সমস্যায় বড়ই গোলমালে পড়েছে...

প্রথম ভূত – কী জিঁনিস রেঁ বাঁবা !

২য় – এঁর নাঁম চঁচমা..

৩য়– কাঁর মাঁ ?

বাকি ভূত–কাঁর মা ! কাঁর মা ! কাঁর মা !

২য়– উঁফ ! চঁচমা ! চঁচমা ! চোঁকের জিঁনিচ...

বাকি ভূত– ঈ... হিঁ হিঁ হিঁ ...ঈ হিঁ হিঁ হিঁ ..ঈ.হিঁ হিঁ হিঁ

প্রথম ভূত– তাঁ কোঁথায় পেঁলি ?

২য় – কোঁতায় আঁবার ! ওঁই গঁজেন বুঁড়োর বাঁড়ি..

৩য়– এঁটা তাঁহলে ওঁই কাঁলা আঁর কোঁনজুস বুঁড়োর মাঁ ?

ঈ হিঁ হিঁ হিঁ ঈ হিঁ হিঁ হিঁ ..ঈ....হিঁ হিঁ হি (সব ভূত গলা মেলায়)।

(হঠাৎ প্রথম ভূত দেখতে পায় দুর থেকে অন্ধকারে লাঠি ঠুকে ঠুকে গজেন বুড়ো আসছে..)

প্রথম ভূত– ওঁই দ্যাঁক কাঁলা বুড়োটা আঁচ চে

৩য় – ওঁমা তাঁইতো...

সকলে – ওঁমা তাঁই তো.. তাঁই তো... তাঁই তো...

প্রথম– তাঁ কাঁলাবুড়ো তোঁকে কিঁ এটা ফ্রিঁতে দিল ?

২য় – আঁরে নাঁ নাঁ ! বুঁড়োর নাঁতনি পুঁটি.. খেঁলতে খেঁলতে এঁটা রেঁকেচিল জাঁনলার পাঁশে... আঁমি তোঁ নিঁয়েই ধাঁ...

প্রথম– চুঁরি কঁল্লি ? অ্যাঁ ! ছিঁ ছিঁ !

সকলে –ছিঁ ছিঁ ছিঁ ছিঁ ছিঁ ছিঁ

প্রথম – এঁটা তোঁ ভুঁতেদের বঁদনাম.. চুঁরি কঁরে তোঁ মাঁনুষের পোঁলারা.. ভুঁতেরা তোঁ কঁক্কনো চোঁর নঁয়...

সকলে– চোঁর নয় চোঁর নয় চোঁর নয়...

প্রথম — দিঁলি তোঁ আঁমাদের পেঁসটিচ টাঁ পাঁনচার কঁরে... ছিঁ ছিঁ..

সকলে– ছিঁ ছিঁ ! ছিঁ ছিঁ !ছিঁ ছিঁ

২য় – কী মুঁচকিল... আঁমি কি অঁত ভেঁবেচি নাঁকি ? আঁমি তোঁ সাঁমনে পেঁয়েই কী জিঁনিস রেঁ বাঁবা ভেঁবেই তুঁলে নিঁয়েচি.. তাঁ নিঁয়েচি যঁকন তঁকন আঁর ফেঁরত দিঁতে কঁতক্কন ?

(এমন সময় গজেন দাদু সেখানে আসে... অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তেও সামলে নেয় নিজেকে...)

গজেনদাদু — উহু হু ! বাবারে বাবা ! কী একখানা হোঁচট যে খেলুম ! বুড়ো আঙুলখানা ফুলে বুঝি আমড়া হয়ে গেল রে.. উঁ হুঁহু হু হু রে ! চশমা ছাড়া পথে নেমে এ কী বিপদ ! এদিকে গাবতলার আড্ডায় এট্টা দিন না গেলিও আমার পেটের ভাতটুকু হজম হয় না... কী অশান্তি.. কী অশান্তি...

(হঠাৎ ঠান্ডা বাতাস দাদুর কানের কাছে দিয়ে বয়ে যায়.. গা-খানা কেমন যেন ছমছম করে ওঠে। দাদুও চমকে ওঠেন) এ কী ! মনে হল যেন কতক ঠান্ডা বাতাস এসে শরীরীডার ওপর দিয়ে হু হু করে বয়ে গেল ! পরানডা যে চমকে উঠল বড় ! কী অশান্তি ! কী অশান্তি !

(এমন সময় ভূতেদের গলার আওয়াজ শোনা গেল.. ঈ... হিঁ হিঁ হিঁ ঈ হিঁ হিঁ হিঁ ..ঈ.হিঁ হিঁ হি)

(বিষম চমকে উঠে গজেন দাদু...) ওরে বাবারে বাবা...

রাম রাম... রাম রাম ! ? রাম রাম !
৩য় – (চমকে উঠে) এঁকি ! এঁকি ! বুঁড়োটা কী যেঁন বঁলে.. ওঁ. কঁত্তা ?
সকলে— ওঁমা তাই তোঁ... তাঁই তোঁ.. তাঁই তোঁ...
প্রথম – (ধমকে) চোঁপ.. ! ভঁয় দেঁকাতে এঁসে নিঁজেরাই ভঁয় পেঁয়ে যাঁচ্ছিস.. পেঁস্টিজ দেঁখি এঁকেবারে পাঁনচার.. ধঁর চেঁপে বুঁড়োকে ধর...
(সক্কলে গজেন দাদুকে ধরতে হাত বাড়ায়..ঈ... হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ.. করতে করতে.. গজেন দাদুও.. ওরে বাবারে বাবা.. বলে লেংচে লেংচে প্রস্থান করেন....)

দৃশ্য ঃ ৩

(.. গ্রামের মেঠো পথ। ছাতা মাথায় চলেছে এক গ্রামবাসী। পথে দেখা আর এক গ্রামবাসীর সাথে। আলোচনার বিষয় গজেনদাদু...)
বিষ্টুপদ – কে ও ! পেরাণগোবিন্দ নাকি ?
প্রাণগোবিন্দ – কে ? অ ! বিষ্টুপদ ? আর বলো কেন ভায়া ? এই আমাদের গজেন খুড়ো... মানে ওই হল গে গজেন চাকলাদার... চিনতে পেরেছ ?
বিষ্টু – তা পেরিচি... চিনেচি.. চিনেচি... বিলক্ষণ চিনেচি.. তা ঘটনা কী ? গজেন চাকলাদার কি পটলডাঙার টিকিট কেটেচে নাকি, ও পেরাণগোবিন্দ ?
প্রাণ– কী যে বল বিষ্টুপদ.. খুড়োর বয়স সবে হল গিয়ে অষ্টআশি। খুড়োর বাপ-ঠাকুরদার আয়ু জানো ? হাসতে খেলতে দেড়শো-দুশোটা বছর লাফ মেরে পেরিয়ে যায়.. সেই বংশের লোক ওই গজেন খুড়ো.. একটু ভেবে চিন্তে কথা বলবা না ? অ্যাঁ কী আক্কেল তোমার !
বিষ্টু – তা বটে ! তা বটে ! তবে ঘটনা কী ? গেঁটে বাত নাকি অম্বলের অসুখ ?
প্রাণ– গেঁটে বাত হতি যাবে কোন দুঃখে ! বলি একশো মিটার দৌড়ে দাঁড় করালে ওই গজেন খুড়োই এখন ছেলে ছোকরাদের ল্যাং মেরে ঠ্যাঁ তুলে দৌড়ায়... অ্যাঁ... তুমি কী যে বল বিষ্টুপদ..
বিষ্টু– তা বটে ! তা বটে ! তাহলে বাপু ঘটনা কী ? খুঁড়োর কি দাঁতের গোড়া ধসে গেল.. অ্যাঁ ?
প্রাণ– আহ ! কী যে বলতি থাকলে... শুনলে হাই ওঠে... একটু ভেবে চিন্তে কথা কবা না ? খুঁড়োর যা দাঁতের বাঁধন... এই বয়সেও দিব্বি মদন কটকটি চিবিয়ে ধুলো করে দেয় ! কী যে বল না হ্যাঁ... !
বিষ্টু – সর্বনাশের দেখি মাথায় বাড়ি... ! তাহলে ঘটনা কী, একটু খুলে কবা ও পেরাণগোবিন্দ ?
প্রাণ– ঘটনা বড় সাংঘাতিক ভায়া... খুড়ো পড়েছে ভূতের পাল্লায়...
বিষ্টু– অ্যাঁ বল কী ?
প্রাণ – তবে আর বলচি কী ঘাড়ে ভূত চেপেছে গজেন খুড়োর। তাই যাচ্ছি ঘন্টু কাপালিকের কাছে... দেখি যদি ভূত নামানোর কোনও বিধিব্যবস্থা করা যায় বুঝলে না ভায়া... দিনকাল তো ভাল নয়..!
বিষ্টু– ঘন্টু কাপালিক ?
প্রাণ– হ্যাঁ ভায়া ! বড়ই তন্ত্র-সিদ্ধ কাপালিক বুঝলে না ! ঘন্টু কাপালিকের কবজ নিলে ভূতও নাকি শুনেছি কপালে তিলক কেটে লোকনাথ বাবার নাম করতে থাকে.. বুঝলে না ভায়া ?
বিষ্টু– তা আর বুঝিনি ভায়া... কেস বড় জন্ডিস.. বিলক্ষণ বুঝেছি.. বিলক্ষণ... (প্রস্থান)...

দৃশ্য ঃ ৪

(ঘন্টু কাপালিকের ডেরা। সামনে হোমের আগুন জ্বলছে। আমের পল্লব... ঘট... কাকের পালক... আরও অন্যান্য উপকরণ বহু ভক্তবৃন্দ ভক্তিভরে সেখানে বসে.. একপাশে হাত জড়ো করে বসে আছে প্রাণগোবিন্দ...)
ঘন্টু–ওং... ওং... (হুঙ্কার ছেড়ে), হ্রিং... ট্রিং.. সাকেলের ক্রিং অং বং... ভূতের ঢং... ভস ভস উচ্ছের রস..
শাকচুন্নি... কন্দকাটা... সবাই আমার বশ...
ওং.... ওং.... হ্রিং ট্রিং ছট ফট
মামদো ভূতের ঘাড় মটকাবো মট...
ওং হ্রিং ট্রিং... হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ (উচ্চ স্বরে হাসি) ওং ওং
(সামনের সকলে হাত জড়ো করে মাথা নেড়ে ওং মন্ত্র জপতে থাকে... হুঙ্কার ছেড়ে ঘন্টু কাপালিক বলতে থাকে)
–কে আসে ! কে আসে আমার সামনে ? কার এত সাহস ! ওং... ওং... হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ (হাসি) প্রহ্লাদ ? প্রহ্লাদ ?
১ম সহযোগী প্রহ্লাদ – আজ্ঞে প্রভু !
ঘন্টু– পার্টির নাম এন্ট্রি করেছিস তো ?
প্রহ্লাদ– সব এন্ট্রি করেছি প্রভু... (ঝোলা থেকে অত্যাধুনিক ট্যাব বের করে.. এন্ট্রি মিলিয়ে নেয়)..
২য় সহযোগী– একেবারে ঘাঁত ঘোঁত সব ক্লিয়ার করে নিয়েছি প্রভু..
ঘন্টু– ওং ওং আর দক্ষিণা.. ?
১ম– দক্ষিণা ? সে তো আগেই ক্লিয়ার করে নিয়েছি প্রভু..! তিন মন আতপ চাল..
২য়– দুই কাঁদি কাঁচকলা...
১ম–জম্পেস সাইজের দুইখানা জোড়া পাঁঠা...
২য়– তিন জোড়া ধুতি গামছা...
ঘন্টু– (উল্লসিত হয়ে) ওং ওং...
প্রাণগোবিন্দ – (একটু আমতা আমতা করে) তা বাবাসকল.. বলছিলাম কী খুড়োর অবস্থা তো তেমন ভালো নয় কো... সহায় সম্বল তো তেমনটা নেই কো... একটু যদি কম সম

...র নাবি দাওয়া করতে বাবাসকল... মানে একটু ইয়ে..
ঘন্টু- (হুঙ্কার দিয়ে) ওং ওং..
১ম ও ২য় সহযোগী - (হুঙ্কার দিয়ে) ওং...
প্র...-(তুতলে) তা..তা... তাই হবে বাবা! তাই হবেখন!
কু...পিত হোয়ো না বাবাসকল! কথায় আছে ভরা দুপুরবেলা... ভূতে মারলে ঢেলা... তা এখন দেখি.. কোথায় দুপুর ... কোথায় রাত... ভূতের ঢেলায় প্রাণ যায় ...   যা চাও সব দেব বাবা... ভূতখান শুধু নামিয়ে দাও খুড়োর ঘাড় থেকে
ঘন্টু- ওং
১ম ও ২য় সহযোগী- ওং...
ঘন্টু-ব্যোম কালি   (হুঙ্কার দিয়ে)
১ম ২য় — ব্যোম কালি... ব্যোম কালি...ব্যোম কালি...!

দৃশ্য ঃ ৫

সন্ধ্যাবেলা। গজেন দাদুর বাড়ির সামনে কড়া পাহারায় ... ...গড়াই গোঁফের দারোয়ান গোলাম সিং।)
...লাম সিং - (কাঁধে লাঠি তুলে পাক খেতে খেতে)..হঃ! ... ভালো লয় কো! রাহু কেতু সব আইছে মাথার ...পর   ঘুরঘুরাইতাছে...। কুছু ভালো লয় কো!...হঃ! ...রে পাক খেয়ে) হামাকে বহুত হুশিয়ার থাইকতে ...কে   হঃ... কর্তাকে তো পিরেতে পাকড়েছে। হামি ...র গোলাম সিং... হামাকে ভি ছোড়বেনা... হঃ   রাম ...   বহুত হুশিয়ার থাইকতে হবে... হঃ   (প্রস্থান)

দৃশ্য ঃ ৬

...বেলা... কথা বলতে বলতে দুই গ্রামবাসীর প্রবেশ)
...- তা বুঝলি রে অঘোর, গজেন খুড়োর কপালে ...   ...ন ঘোর বিপদ।
...- কী জ্বালা বলতো কৃষ্ণকান্ত, এই বুড়ো বয়সে ... হারিয়ে গজেন খুড়ো দেকচি বড়োই ভেঙে পড়েচে।
...- শুধু কী চশমা? একে রাম বনবাসে.. তায় সুগ্রীব ও ...   খুড়োকে শুনলাম ভূতে পেয়েছে...
...- আঁ... বলিস কী? ভূত কী গজেন খুড়োর ঘাড়ে ...   নকি খুড়োই নিজে গিয়ে ভূতের ঘাড়ে চেপে ...লো আাঁ!
...- ...নয় রে অঘোর... ঠাট্টা নয়... খুড়োর এখন নট ...ন অবস্থা বুঝলি না রে ...! ঘাড় হেলে পড়েছে ...   মুখ দিয়ে দেখি লালা ঝরে... দেখে কাউকে ... চিনতে পারে না।
...- ...স কী ভাই!
...- ...র আর বলছি কী! খুড়োর যে অমন এক নাতনি ...   ...রেই নাকি দেখলে বলে, কে? হরির মা?
...- ...স কী?

কৃষ্ণ- তবে আর বলছি কী? এই তো গাঁয়ের পাঁচজনে মিলে কাল শনিবারে খুড়োকে নিয়ে যাচ্ছে ঘন্টু কাপালিকের কাছে। চল গিয়ে দেখে আসি রগড়খানা।
অঘোর- কালকেই?
কৃষ্ণ- হ্যাঁ কালকেই। একে তো বারে শনিবার তায় পড়েছে ভরা অমাবস্যা... ভূত নামানোর মোক্ষম সময়... কী থেকে যে কী হয় বলা দায়...
অঘোর- তাহলে তো যেতে হচ্ছেই... কালকেই তাহলে কী বল!
কৃষ্ণ— এতে আর বলাবলির কী আছে ভাই... কালকে মানে কালকেই.. কথার কোনও নড়চড় নেই! (প্রস্থান)

দৃশ্য ঃ ৭

(গজেন দাদু পাগলের মতো আচরণ করছে। কাউকে ঠিকমতো চিনতেই পারছে না। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। আর ঘাড় একদিকে কাত করা...)
গজেন- কে ও হরির মা?   অ্যাঁ.. কী গেরো... কী গেরো.. কে ও হরির মা? (পুঁটির প্রবেশ.. তাকে দেখে) ..কে ও হরির মা?
পুঁটি-(মুখ ঝামটা দিয়ে) চোখের মাথাখানা কি খেয়েছ, ও বুড়ো? আমি কি হরির মা?
গজেন- ওঃ তা বটে! তা তুই কেডা মা, হরির মা?
পুঁটি- আমাকে রাগিও না বলছি বুড়ো। আমি রেগে গেলে না, ইট মেরে তোমার টাকটি ফাটাবো, তখন দেখবে মজা.!
গজেন- অ্যাঁ ঢাক বাজবে! তা তো বটেই! দুগ্গা পুজোয় ঢাক বাজবে না তো শাঁখ বাজবে...! তা কে ও হরির মা?
পুঁটি-(কপাল চাপড়ে) কী জ্বালা রে জ্বালা! কী করতে যে বুড়োর চশমাটা আমি হারিয়ে ফেল্লাম... এখন আমাকেই তো কালা বুড়ো জ্বালিয়ে মারছে। আমি নাকি হরির মা... বুড়োর মাথাটা গেছে রে.. পুরো ঢিলা হয়ে গেছে... উফ! (প্রস্থান)।
গজেন -(মাথা নাড়তে নাড়তে) কে ও... হরির মা (প্রস্থান)

দৃশ্য ঃ ৮

(গজেন বুড়ো সন্ধ্যাবেলা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে আপন মনে বাড়ির উঠোনে আর সাথে ভুল বকে যাচ্ছে... এমন সময় সেখানে হাজির হল ভূতের দল)
গজেন- কে ও হরির মা?
প্রথম ভূত- এঁজ্ঞে.. আঁমরা কঁত্তা! ভূঁত বিঁন্দ।
গজেন - তা বটে! তা বটে! তা কেডা? হরির মা?!
প্রথম- এঁজ্ঞে আঁমরা মাঁনে... ভূঁত বাঁবাজীরা... আঁপনার চঁচমাটা ফেরত দিঁতে এঁচেচি...।
গজেন- অ! তা বটে! তা কে, ও হরির মা?
২য় ভূত- কঁত্তা এঁ যেঁ উঁলটো পাঁলটা বোঁকচে দেঁকচি..

সব ভূত-(একসাথে) তাঁই তো... তাঁই তো... তাঁই তো... বোঁকচে... বোঁকচে... বোঁকচে....
১ম ভূত- তোঁরা থাম ছোঁড়া ! ভুঁলটা যঁকন আঁমাদের তঁকন গোঁলমালটা ও ঠিঁক কঁত্তি হঁবে আঁমাদের...
২য়- এঁকন কিঁ হঁবে কঁত্তা ?
১ম – ওঁরে তোঁরা সঁবাই মিঁলে বুঁড়ো কে চেঁপে ধঁর... তাঁরপর বুঁড়োর ওঁই মাঁ-কে বুঁড়োর নাঁকে গুঁজে দেঁ বাঁপ...
২য়- মাঁ নাঁ কঁত্তা... চঁচমা...!
১ম- (ধমক) চোঁপ ...! ওঁই হঁল গেঁ... ধঁর সঁবাই.. বুড়োকে চেঁপে...!
ভূতেরা- ধঁর ধঁর... ধঁর ধঁর.. চেঁপে ধঁর চেঁপে ধঁর...!
(সবাই মিলে গজেন দাদুকে চেপে ধরে... আর বুড়ো কেবলই ভুল বকতে থাকে। ভূতেরা চশমা পরিয়ে দিলে চশমা চোখে দিয়ে বুড়ো আগের মতো সব কিছু দেখতে পায়...)
গজেন –(চারদিকে চমকে তাকিয়ে) একি ! আমার চোখে চশমা এল কী করে ! তোরা কারা বাপ ? উ উ রে বাবারে! ও মাগো রে.. এ আমি কী দেখলাম.. রাম রাম ! রাম রাম..
১ম ভূত-(হাত জড়ো করে) কঁর্তা.. আঁপনি এঁকটু শাঁন্ত হঁন কঁত্তা... আঁমাদের দেঁকে ভঁয় পাঁবেন নাঁকো...
সব ভূত- ভঁয় নেই... ভঁয় নেই... ভঁয় নেই...
গজেন – একি বাবারে ? তোমরা আমার বাড়ি কী মনে করে বাবারা ? বলছ তো ভয় নেই... দেখে তো আমার কলজাটা শুকিয়ে বরফ হয়ে যাচ্ছে বাবারা ? অধমের কী দোষ দেখলে বাবারা !
১ম – আঁর লঁজ্জা দেঁবেন নাঁ কঁত্তা... এঁমনিতে লঁজ্জায় মুঁক তুঁলতে পাঁরি নে.. আঁমরা এঁচিচি আঁপনার কাঁছে মাঁফ চাঁইতে কঁত্তা... আঁমাদের মাঁপ করে দেন...
সব ভূত- মাঁপ চাঁই ! মাঁপ চাই.. মাঁপ চাই...
গজেন- (কেসে) আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে বাবারা! চোকেএকন পষ্ট দেখতে পাচ্ছি !কানে একন পষ্ট শুনতে পাচ্ছি.. বয়সটাও বড় কম কম ঠেকছে যেন... তোমরা আমার এতবড় উপকারডা করলে আর মাফ চাচ্ছো কিসের জন্যি বাবারা ?
১ম – কঁত্তা লঁজ্জায় আঁমরা মুঁক তুঁলতে পাঁরছিনে... তঁবু বঁলছি... আঁমরা আঁপনার চঁচমা চুঁরি কঁরেচি.. আঁপনাকে ভঁয় দেঁকিয়েচি.. তাঁই মাঁপ চাঁইতে এঁয়েচি...
গজেন- অ্যাঁ ঠিক শুনছি তো ? এ ও কি সম্ভব ?
১ম – ঠিঁকই শঁনিচেন কঁত্তা ! ভুঁরেরা কঁক্ষোনো চোঁর নঁয় ।
সব ভূত- চোঁর নঁয়... চোঁর নঁয়...
গজেন – তা তো বুঝলাম বাবার... ভূঁতেরা দেখছি বরং ভালো.. মানুষই বড় খারাপ...
১ম- যাঁওয়ার আঁগে আঁপনার কাঁচে এঁকটা নিঁবেদন আঁচে কঁত্তা...
গজেন – (কেসে) অ্যাঁ ! নিবেদন ? কী নিবেদন বাবারা ?
১ম –পাঁড়ায় যেঁ আঁমাদের বঁদনাম চঁলছে.. তাঁ তো আরঁ সঁইতে পাঁরিনে...
২য়- আঁমরা নাঁকি আঁপনার ঘাঁড়ে চেঁপেচি...
সব ভূত- চাঁপিনি... চাঁপিনি... চাঁপিনি...
গজেন – তা তো বটে ! তা তো বটে ! ঘাড়ে চাপতে যাবে কোন দুঃখে.. আমিই একটু ভড়কে গেছিলুম... তা তোমরা তো আমার উপকারটাই করলে বাবারা !
১ম- আঁপনার ঘাঁড়ে নাঁকি আঁমরা চেঁপেচি... তাঁই গাঁয়ের লোঁক গেঁচে ঘোঁন্টু কাঁপালিকের কাঁচে... আঁমাগো নাকি টাঁইট দেঁবে ওঁরা... এঁটা তোঁ কঁত্তা অঁন্যায়.....!
গজেন- অন্যায় মানে ! আলবাত অন্যায় ওই ঘন্টু কাপালিককে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি ! ও ব্যাটা একখান আস্ত চোর ! ও নামাবে আমার ঘাড় থেকে ভূত ? দাঁড়াও দেখাচ্ছি ওর ভূত ছাড়ানো... তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো ..! এ পাড়ার কাউকে আমি ঘন্টু কাপালিকের কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছি না বাবারা !... তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো...
১ম ভূত- তাঁহলে আঁসি কঁত্তা !
সব ভূত- পোঁনাম হঁই... পোঁনাম হঁই... পোঁনাম হঁই...
গজেন –(কেসে) তা এসো বাবারা.. তোমরা যে আমার কী উপকার করলে... আজ থেকে আমার আর ভূতের উপর কোনও রাগ থাকল না... আমি মানুষকে অবিশ্বাস করব তাও আচ্ছা, কিন্তু ভূতকে আর অবিশ্বাস করছি নে... এ আমি বলে রাখলাম... কই রে পুঁটি কোথায় গেলি.. আমার জন্যে একটু তামাক সেজে দে তো মা (কাসি)...

-প্রস্থান-

ঝড় থামেনি

[illegible]নপদ বিজলী

[illegible] ঝড়, কড়াৎ কড় ভাঙছে ডাল
[illegible]খির বেজায় দাপট উড়ছে চাল
[illegible] ডাকছে পাখি, কোথায় মা ?
[illegible] তুমি থামবে কখন ? থেমে যা।
[illegible] করে হচ্ছে আওয়াজ, বিপর্যয়

[illegible] চেঁচিয়ে ক'জন কথা কয়
[illegible]কেই ফেরেনি তো গরুর পাল
[illegible] পড়ছে খসে গাছের তাল।

[illegible] কোথায় ছিল চিলতে মেঘ
[illegible] তেড়েফুঁড়ে ঝড়ের বেগ
[illegible]তে রণক্ষেত্র, এ কী বাপ !
[illegible] দোহাই তোমার করো মাপ।

স্বপ্ন ছবি

[illegible] চন্দ্র

[illegible] কবি তোর ভাবনাগুলো উড়িয়ে দে না সাগর জলে
[illegible] কবি তোর স্বপ্নগুলো হারিয়ে যাবে দু'দিন গেলে।
কবি তোর আনমনা ওই ঝর্ণাতলে আমায় নিয়ে যাস কখনো
কবি তোর পদ্মপুকুর এক পশলা মেঘের জলে পাস কখনো ?
কবি তোর আঁকিবুঁকি খাতার মাঝে আমার বুকে তুফান তোলে
কবি তোর কল্পনাতে কুঁড়েঘর ওই একলা মাঠের ছোট্ট কোলে।
[illegible] কবি [illegible]য়না ফিরে দু'দিন জীবন ভাবনা কীসের ?
[illegible]র বাঁধব যেদিন অমৃত বা সাপের বিষে
কবি তোর হৃদয়টাকে আটকে রাখে কোন পাষাণি
[illegible] সব বাধা ওই অহংকারের ঘুম পাড়ানি।
কবি তোর সাতসকালে পিরিত জ্বেলে খুঁজিস কাকে ?
কবি তোর ভালোলাগার মন্দ কথা বুকের জ্বালা মেটাস কাকে ?
কবি তোর কলম খানি সোনায় মোড়া মনের মতো
কবি তোর ভালোবাসার মিষ্টি কথা খাতায় আঁকিস ইচ্ছে যত।
কবি তোর ইচ্ছে মতো এক পশলা বৃষ্টি দে না
[illegible] ভিজবো দু'জন জাপটে রব নাহয় কেনা।
কবি [illegible] আর কতদিন চোখ রাখবো দুয়ার পানে
[illegible]সার মন্দ কথা বলবি আবার কানে কানে
[illegible] কবি তুই ঘুমাস কীসে স্বপ্ন তরী গায়ে মেখে
[illegible]খের ঘুম কে নিলো কোন মিঠুয়া, বলনা কবি আমায় দেখে।

কী সুন্দর

বসুন্ধরা মাজি

পাখি দিগন্তিকার নীলে,
যখন মেলছে হলুদ পাখা —
আকাশ রোদরাঙা ঝিলমিলে,
যেন রং তুলিতে আঁকা।

বাগান ভর্তি গোলাপ, লিলি,
সাথে সিজন ফ্লাওয়ার নানা —
কোথাও কমলা গাঁদার বনে,
বসে গঙ্গাফড়িং ছানা।

পাশে লাল ডালিয়ার ফুলে,
রঙিন পেরজাপতি নাচে —
কচি ঘাসের সবুজ লনে,
ফুলের পাপড়ি পড়ে আছে।

মাঘের মিষ্টি বিকেলবেলা,
আলো ফুরিয়ে এলো বলে...
তুতুল ভাবতে শুধুই থাকে,
মনের ইচ্ছেরা ওর দোলে...

তুতুল ভাবছে আপনমনে,
এবার আসন্ন এই শীতে,
বাগান ভরিয়ে দেবে ও যে,
একে বাস্তবে রূপ দিতে।

অগস্ত্য যাত্রা

ত্রিদিব ঘোষ রায়

ট্রেনে চেপে হল হাজির এক দঙ্গল ভূত
শুনছি আমি, ওরা নাকি মামদো ভূদের দূত।
কলকাতাতে থাকবে ক'দিন ঘুরবে চারদিক
রাতের বেলায় দেবে হানা এই করেছে ঠিক।
প্রথম যাবে ছাপাখানায় করবে বানান ভুল
শশ্মান ঘাটে বসবে গিয়ে, নড়বে না একচুল।
শহর জুড়ে করবে তারা সব কিছু ছারখার
ভয় দেখাবে, ধরবে তাদের এমন সাহস কার।
রাতের বেলায় মশাল হাতে বেরোয় শহরবাসী,
ভূতের দলও ভয়ের চোটে হল কাশীবাসী।

রায় কাকিমা খুন হলেন

অমল ত্রিবেদী

সকাল থেকে পাড়ায় সে কী হই চই ! ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেলাম। সামনের বাড়ির সামনেই প্রচণ্ড ভিড়। পাড়ার সবাই সেখানে। আবার পুলিশের গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। আমার ছেলে টিমটিমও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। কোন রকমে গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে সোজা দৌড় দিলাম সেদিকে। এটা তো রায় ভিলা। রায়বাবু বহুদিন হল গত হয়েছেন। কাজ করতেন সেনাবাহিনীতে। আমার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। আমি রায়কাকু বলেই ডাকতাম। ওঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমার রায়কাকিমা একাই বাড়িতে থাকতেন। সারাদিন দেখাশোনার জন্য থাকত পিংকি। পাশের বস্তিতে ওরা থাকত। রায়কাকা ছোট্ট পিংকিকে নিয়ে এসেছিল দশবছর আগেই। তখন কতই বা বয়েস। এগার-বার বছর হবে। সেই থেকে পিংকি কাকিমার বাড়িতেই থাকে। বাড়ির সব কাজকর্ম করে। রান্না বান্না করে। কাকিমার দেখাশোনার যাবতীয় দায়িত্ব এই পিংকির। রায় কাকিমাও তাকে ভালবাসেন নিজের মেয়ের মতই। কী হল এমন রায়বাড়িতে ?

কাছে গিয়ে যা শুনলাম, তাতে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যেন পায়ের তলা থেকে মাটিটাই সরে গেল মুহূর্তের জন্য। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। পড়েই যেতাম হয়তো। কে যেন ধরে নিল আমায়। রায় কাকিমা গতরাতে খুন হয়ে গেছেন। বাথরুমের সামনে তার দেহ পড়ে আছে। একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধার এমন পরিণতি স্বপ্নেও ভাবা যায় না। পাড়াময় সে কী উত্তেজনা। পুলিশ কুকুরও এল কিছুক্ষণ পরেই। আমাদের সবাইকে সরিয়ে বাড়ির বাইরে বের করে দিল পুলিশ। বাড়ির সামনেটা একেবারে ফাঁকা করে দিল।

একটু পরেই দেখলাম পুলিশ পিংকিকে ধরে এনে গাড়িতে তুলে দিল। আমরা তো সবাই অবাক। পিংকিকে কেন ধরছে পুলিশ ? আমরা ভাবতেই পারিনা মেয়েটা দোষী। সে যে কাকিমার মেয়ের মত ছিল। কাকিমার সুখে দুখে সে দীর্ঘ দশবছর ধরে জড়িয়ে ছিল। রায় কাকিমার ওষুধ আনা, বাজার করা, বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, চুল বেঁধে দেওয়া, রেশন আনা, ইলেকট্রিক বিল দিয়ে আসা সবই তো করত পিংকি। নিঃসন্তান কাকিমার তো সেই ছিল একমাত্র ভরসা। হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে সে গাড়িতে গিয়ে বসল। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলে আছে। চুল আলুথালু। জানা গেল, সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই প্রথমে কাকিমাকে পড়ে থাকতে দেখে। ছুটে যায় সে। কাছে গিয়ে দেখে রক্তে ভেসে আছে মেঝে। কাকিমা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ও সঙ্গে সঙ্গে কাকিমাকে চিৎ করে শুইয়ে দেয়। কাকিমা সাড়াশব্দ দিচ্ছেনা দেখে পিংকি ল্যান্ডফোন থেকে একশো নম্বরে ডায়াল করে। থানায় ফোনে জানায় এই ঘটনা।

একটু পরেই পুলিশের ভ্যান এসে দাঁড়ায় রায়ভিলার সামনে। তারপরের ঘটনা তো আমার নিজের চোখেই দেখা। পুলিশ-তদন্ত চলছে। ফটোগ্রাফার এসে পটপট ছবি তুলছে। শুনলাম গোয়েন্দারাও নাকি এসেছে। লালবাজার থেকে সি আই ডি অফিসার। বাড়ি ফিরে এলাম। কিছুই ভাল লাগছে না। টিমটিমের মা এসে বলল, চা খেয়ে নাও আগে। তারপর বাথরুমে যেও। চা খাব কী, চা মুখে দিতেই ইচ্ছে করছে না। এতক্ষণ চোখের সামনে যা দেখলাম তাই আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। কিছুই ভাল লাগছে না। আমাদের পাড়ায় এ কী হল ? এ পাড়ায় খুন তো দূর আজ পর্যন্ত তেমন চুরিডাকাতিও হয়নি। সেখানে জলজ্যান্ত একটা

[illegible] ভাবাই যায় না। রায় কাকিমা আমাদের সকলের খুব প্রিয় ছিলেন। গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পাড়ার সবার [illegible] করতেন। ছোটদের ডেকে লজেন্স দিতেন। কাকা [illegible] হওয়ার পর থেকে আমরা সময় পেলেই কেউ না কেউ [illegible] খোঁজ নিতাম। মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে [illegible] ধরেন, সেও স্কুলে যাবে না। [illegible] ওকে জোর করেই স্কুলে পাঠাল, [illegible]

[illegible] বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেরা রায় [illegible] থানার বড়বাবু ওদের দেখাশোনা করার [illegible] বাড়ির চাবিও দিয়েছেন। রায় কাকিমার [illegible] থাকেন। তিনি নাকি শিঘ্রি আসছেন [illegible] পেতে দেরি হচ্ছে তাই। ওমা, কদিন পর [illegible] বাড়িতে ফিরে এসেছে। বাড়ি বলতে ওর নিজের [illegible] রামকৃষ্ণ কলোনিতে। যেখানে ওর মা ও [illegible] একবার নাকি আমাদের পাড়ায় ঢুকেছিল [illegible] জিনিসপত্র নেবার জন্য। ক্লাবের ছেলেরা [illegible] তাড়িয়ে দিয়েছে। পাড়াতে ঢুকতেই দেয়নি। [illegible] তেমন কোন তথ্য প্রমাণ না পেয়ে থানাই [illegible] দিয়েছে। আমারও তাই মনে হয়েছিল, পিংকি [illegible] পারেনা।

[illegible] পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। কাকিমার [illegible] কাকা এসে উপস্থিত বিদেশ থেকে। তখনই [illegible] কাকিমার আলমারির লকারে যে সব সোনার গয়না [illegible] নেই। শুনলাম, প্রায় কুড়ি ভরির মত [illegible] কাকিমার আমরাও অবাক। কারণ এত গয়না [illegible] বাড়িতে রাখে? ব্যাঙ্কের লকারেও তো রখতে [illegible] কাকিমা কাকিমার শেষকাজ করলেন [illegible] আমাদেরও নিমন্ত্রণ ছিল। টিমটিম ও ওর মা [illegible] আমি অফিস যাবার নাম করে পালিয়ে [illegible] কাকিমার শ্রাদ্ধের ভোজ খেতে আমি অন্তত পারব [illegible] আমার মা চলে গেছেন। কাকিমাকে [illegible] মায়ের কথাই মনে পড়ত।

[illegible] ছুটিতে এসেছিলেন বিন্দাসকাকা। ছোট [illegible] ডাকতাম কাকাকে। থানা ও ক্লাবের সঙ্গে [illegible] বাড়িতে এক ভাড়াটিয়া রাখলেন। থানার [illegible] ঠিক করে দিলেন। পাড়ার হাইস্কুলের এক [illegible] ও তার স্ত্রী। সবে বিয়ে হয়েছে ওদের। দুটি ঘরে [illegible] সব মালপত্র ঠেসে ঢোকানো হল। ঐ ঘরে তালা [illegible] দেওয়া হল আমাদের বাড়িতেই। কাকিমার [illegible] নেই। রায় কাকুরও আর কেউ কোথাও আছেন [illegible]

[illegible] ছ'মাস পার হয়ে গেল। আমরাও কাকিমার [illegible] প্রায় ভুলতে বসেছি। আজ পর্যন্ত কেউ ধরাও পড়েনি। রোজ অফিস যাই আর রাতে ফিরি। হঠাৎ ঘটে গেল এমন একটা কাণ্ড, যার জন্য আমরা কেউই তৈরি ছিলাম না। সেদিন অফিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই শুনলাম পিংকি ও ওর ভাই'য়ের ঘটনা। পিংকির ভাই বউবাজারে সেনজুয়েলারিতে বিক্রি করতে গিয়েছিল প্রচুর গয়না। দোকানির কেমন যেন সন্দেহ হয়। বস্তির এমন চেহারার একটি ছেলে যে কিনা বলছে এসব তার মায়র গয়না, বাবার চিকিৎসার জন্য বিক্রি করতে এসেছে। অপারেশনের জন্য অনেক টাকার দরকার। তাকে চেপে ধরতেই গয়নার প্যাকেকটি তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে পিংকির ঐ ভাই। গেটের সিকিউরিটি ওকে ধরে ফেলে। পুলিশে খবর যায় দোকান থেকে। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায় লালবাজারে। ঐ দিনই গাড়ি এসে পিংকিকেও তুলে নিয়ে গেছে। আমাদের পাড়ায় আবার সে কী উত্তেজনা।

পরদিন সকালে বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেরা এসে খবর দিল আসলে কী হয়েছিল। পিংকি ও ওর ভাই জেরার মুখে সব স্বীকার করে নিয়েছে। দু'জনকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

জানতে পারলাম, অসৎসঙ্গে পড়ে পিংকির ভাই রাজু একেবারে বখে গেছিল। চুরি, ছিনতাই, নেশা করা সবেতেই হাত পাকিয়েছে সে। পিংকি সবই জানত কিন্তু কোনদিন কাকিমাকে কিছু বলেনি। দিদিকে বলে মাঝে মধ্যে ঐ বাড়িতে ও শুতে আসত। রাজু সবই জেনে গিয়েছিল কাকিমার টাকা, গয়না কোথায় থাকে। ঐ রকমই একরাতে ও শুতে আসে কোমরে ছুরি গুঁজে। পিংকি পাশের ঘরে শুতে গিয়ে দরজা বন্ধ করতেই সজাগ হয়ে ওঠে রাজু। কাকিমাও দরজা বন্ধ করে দেন। রাজু শুয়ে পড়ে ডায়নিং রুমে। অনেকরাতে রাজু কাকিমার দরজায় ঠকঠক করতেই কাকিমা দরজা খুলে দেন। অমনি ছুরি নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজু। ছুরি মেরে মেরে তাঁর সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। চাবি দিয়ে আলমারি খুলে সে বের করে নেয় লকারের সব গহনা। সামনের গেটে চাবি দিয়ে সেই চাবি নিয়েই শুয়ে পড়ত পাশের ঘরে পিংকি। ফলে সেই চাবি না পেয়ে রাজু বাড়ির পিছনের দরজা খুলে বাগান দিয়ে পালিয়ে যায়

সকালে মৃত অবস্থায় কাকিমাকে দেখে সবই বুঝতে পারে পিংকি। কারণ বাড়িতে তার ভাই নেই। সে কিন্তু ভাইকে বাঁচানোর জন্য সব কথা চেপে যায়। শুধু কাঁদতে থাকে। পুলিশকে সব কিছু বলে দিলে ভাল মেয়েটা কিন্তু বেঁচে যেত। সব কথা লুকোনোর জন্য বেচারা গ্রেপ্তার হল। রাজু পুলিশকে জানিয়েছে, তার দিদির কোন দোষ নেই। সে কিছুই জানত না। তবু তো জেলে যেতে হবে পিংকিকে, যাকে কাকিমা নিজের মেয়ের মত বিশ্বাস করতেন। রাজু ছ'মাস পর ঐ গয়না বিক্রি করতে গিয়ে ধরা না পড়লে আমরা তো কিছুই জানতে পারতাম না। রায় কাকিমার খুনের রহস্য চিরটাকাল রহস্যঘেরা থেকে যেত।

হাওয়া বদল

খন্দকার মাহমুদুল হাসান

দাঁত বের করে ঘরে ঢুকতেই বাবার মুখোমুখি হয়ে গেল মিতুল। আর ওকে দেখতেই বাবা বলে উঠলেন, কী রে, আজ না তোর রেজাল্ট দেওয়ার কথা।

শুনে মনে হলো, তিনি ওকে প্রশ্নটা করার জন্যে তৈরি হয়েই ছিলেন। দেখামাত্রই তাই ছুড়ে দিয়েছেন প্রশ্নবাণ। কিন্তু উত্তর দিতে দেরি করাও তো চলেনা। তাই একটু আমতা আমতা করে জবাব দিল সে, হ্যাঁ দিয়েছে।

—তা কী ফলাফল করলে ? সারা বছর তো গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়িয়েছ। কত নম্বর পেলে ?

—বিরানব্বই।

— মানে ? বলছো কী ? বিরানব্বই নম্বর ? অতগুলো নম্বর পেয়েছ ? কোন সাবজেক্টে ? অঙ্কে নাকি ? কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকের মতো মিনমিনে গলায় জবাব দিল সে, অল সাবজেক্টে।

বাবাতো এবারে লাফিয়ে উঠলেন, অল সাবজেক্টেই বিরানব্বই করে ? এও কী সম্ভব ? নাকি অঙ্কে বিরানব্বই পেয়েছো ?

গলার স্বরটা আরও একটু নামিয়ে একেবারে ফ্যাসফেঁসে গলায় বলে উঠল মিতুল, না মানে....

গলার আওয়াজটা ও এতটাই নামিয়ে আনলো যে তা শোনাই দুস্কর। তবুও বাবার কান খাড়া ছিল বলে তিনি ঠিকই শুনে ফেললেন। অধৈর্য হয়ে বললেন তিনি, ওই মানেটা আবার কী ?

শান্ত গলায় জবাব দিল মিতুল, মানে মোট নম্বর।

কথাটা শোনার সাথে সাথে কপালে চোখ উঠে গেল বাবার। 'তবে রে শয়তান' বলে বাবা তেড়ে যেতেই মুখ শুকিয়ে গেল ওর। এবার দ্রুত আত্মরক্ষার কৌশল স্থির করে মুহূর্তেই মিলিটারি কায়দায় অ্যাবাউট টার্ন করে দরজা গলিয়ে সাঁতারের জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙিতে বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল উঠোনে। তারপর আর কী ? বড় সড়কের জনারণ্যে মিশে যেতে দেরি হল না মোটেই। পথে পথে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একটা মোড়ের মুদি দোকানের সামনে রাখা বেঞ্চিতে বসে পড়ল সে। বেশ একটু খিদে ভাব হয়েছে। কিন্তু পকেট গড়ের মাঠ। ফুটো পয়সাটিও নেই। তাই ঝুলিয়ে রাখা চিপ্স-চানাচুরের প্যাকেটগুলোর দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকাই সার। ওদিকে বেশ কিছুক্ষণ ওকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে ছোকরা গোছের দোকানদারটা খুবই অভদ্রভাবে ওকে জিজ্ঞেস করল, কী চাই ? এসেছে কেন ? চিপস্ নেবে, না বিস্কুট ? ফ্রিজে আইসক্রিমও আছে।

কিন্তু দোকানদার যেহেতু ওর পকেটের খবর রাখে না, তাই ওকে বার্গার-হটডগ খেতে বললেই বা কী! তবে ও বুঝল, দোকানদারটা ওকে তাড়াতে চাইছে। তাই দোকানদারকে একটু তেতো গলায় জবাব দিল, আপনার দোকানের সামনের বেঞ্চে বসতে হলে ভাড়া দিতে

[illegible] ?

এই জবাবে দোকানদার এগিয়ে এসে মারদাঙ্গা [illegible] ভিলেনের মতো দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, [illegible] এক্ষুণি ভাগ এখান থেকে।

[illegible] সাথেই স্প্রিঙের মতো আসন থেকে লাফিয়ে [illegible] হয়ে উঠল মিতুল। অবশ্য মনে মনে বুঝল, [illegible] একা একা এসে মস্তানি করলে খুব বেশি সুবিধে [illegible] তাই তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পলায়নের। [illegible] একটা না করে রণে ভঙ্গ দিলে মান-সম্মানের [illegible] হয়ে যাবে ভেবে পায়ের কাছ থেকে ইটের একটা [illegible] নিয়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় চলে গেল, [illegible] দোকানদারের মাথা বরাবর ছুড়ে মারল। লাগলও ঠিক [illegible]। তাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেচারার গালদুটো [illegible] জোড়া সরু পটলচেরা হয়ে গেল। একসাথে [illegible] ঠোঁট জোড়া সমমেরুর চুম্বকের মধ্যে বিকর্ষণ [illegible] শুরু করে পরস্পর থেকে এতটাই দূরে [illegible] তালু এবং জিহ্বা পুরোটাই দেখা যেতে লাগল। [illegible] হাতে কপাল চেপে ধরে কীযে মরণচিৎকার [illegible] তা আর বলব কী ! ভাগ্যিস দোকানে তখন [illegible] তাই লোক জড়ো হওয়ার আগেই এক দৌড়ে [illegible] হলো

[illegible] ঘনিয়ে আসায় রাতের আশ্রয়টা নিয়ে ভাবনা [illegible] কোথায় যে যাবে। বাড়ি ফেরাতো কঠিন [illegible] ঠন্ ঠন্ বলে গাড়ি ঘোড়ায় চাপার উপায় [illegible] ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা পথ হেঁটে বন্ধু হাবুলের [illegible] হাজির হলো। তবে কথায় আছে না, যেখানে [illegible] সেখানেই রাত হয়। ও ঢুকেছে, প্রায় ওর [illegible] অংকের শিক্ষক রহিম স্যারও ঢুকলেন। তিনি [illegible] বাবা হরিহর আত্মা। এখানে আসার আগে [illegible] বিবেচনাতেই আনেনি। কিন্তু ও তো তখন, [illegible] ঘাড়ে'। চুরি করার সময় চোর ধরা পড়লে [illegible] ওরও সেই অবস্থা। ওকে দেখেই রহিম স্যার [illegible]। তারপর বিচিত্র এক হাসি দিলেন। কিন্তু [illegible] উদ্ধার করতেই অনেকটা সময় পেরিয়ে [illegible] এরপরও কিছুতেই বুঝতে পারল না যে, তিনি [illegible] উপহাস করছেন, নাকি আনন্দ পেয়েছেন। [illegible] তার মুখ থেকে সেই হাসির অবশেষটিও মিলিয়ে [illegible] কোণা মুখটার ফোলা ফোলা মাংসগুলো বার [illegible] স্থির হলো। তারপর মেঘডাকা গলায় হুংকার [illegible] তোমার মতো প্রতিভাবানের দেখা তো সচরাচর [illegible]

এবারে বেশ অপ্রস্তুত হলো সে। কারণ এ বছরের [illegible] পরীক্ষাতেই অংকে সে ডাবল জিরো পেয়ে [illegible] ডাবল জিরোর রেকর্ড ও'ই প্রথম গড়ল কিনা, [illegible] মহলের দৃষ্টি সে খুব সহজেই আকর্ষণ করতে পেরেছে। আর স্বয়ং অংকের স্যারের মুখোমুখি হয়ে যাওয়াটা ওর জন্যে যে কতটা বিব্রতকর তা হাড়েহাড়ে টের পেল সে। রহিম স্যার রসগোল্লার মতো চোখ গোল গোল করে ওর চির পরিচিত চেহারাটাই নতুন করে দেখতে শুরু করলেন। ওই চোখের সামনে চিড়িয়াখানার প্রাণীর মতো নিজেকে অসহায় মনে হলো ওর। এরই মধ্যে বলে উঠলেন স্যার, দাওতো তোমার বাবার মোবাইল ফোন নম্বরটা।

কথাটা খচ্ করে বিঁধল ওর বুকে। বাবার ফোন নম্বর যে উনি মশকরা করার জন্যে চাইছেনা না, তা ওর ভালোই জানা। তাই নীচু গলায় বলল, মনে পড়ছে না স্যার। স্যার দ্রুত জবাব দিলেন, তা মনে পড়বে কেন ? বাঁদরামির ফর্মুলাগুলোতো সবসময়ই মনে থাকে। ঠিক আছে, আমিই জোগাড় করে নিচ্ছি।

মিতুলের বাবা শহরে বেশ পরিচিত। তাই কয়েক জায়গায় ফোন করে সহজেই বাবার ফোন নম্বরটা হাসিল করে ফেললেন তিনি। পরের ঘটনাগুলো তাড়াতাড়ি ঘটল। স্যার বাবাকে ফোন করলেন। বাবার মোটর সাইকেলের হর্ণ বেশ খানিকক্ষণ পর বেজে উঠল হাবুলদের বাড়ির সামনে। তবে এরই ফাঁকে রহিম স্যারের সাথে ওর কিছু কথাবার্তা হলো।

বাবা ঘরে ঢুকতেই তাকে অবাক করে দিয়ে স্যার বললেন, আসুন আসুন। আমি ওর সাথে কথা বলেছি। ও আমায় কথা দিয়েছে, আর এমনটি হবে না। আসলে ও আমার সাথে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছে। আমরা কেউ ওর বন্ধু হইনি, ওকে বোঝারও চেষ্টা করিনি। এবার থেকে আমি আপনি সবাই ওর বন্ধু হব। পড়ালেখার আনন্দটা যে কোথায় তা আমি ওকে বুঝিয়েছি। আশা করি ও এবার মনোযোগী হবে।

সবকিছু শুনে বাবাও থমকে গেলেন। পুরো ব্যাপারটাই খুব কাকতালীয় বলে মনে হলো বাবার কাছে। তিনি অগ্নিমূর্তি নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন, কিন্তু কথার শেষে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। মিতুলও কাঁদতে কাঁদতে বলল, ভুল হয়েছে বাবা, পড়াশোনায় আর অবহেলা করব না।

চোখ মুছতে মুছতে বাবা ছেলেকে নিয়ে মোটর সাইকেলে রওনা দিল।

পিছু পিছু হাবুল এসে জিজ্ঞেস করল স্যারকে, মিতুল তাহলে বাড়ি গেল ?

স্যার ধরা গলায় বললেন, হ্যাঁ গেল। তবে এই মিতুল সেই মিতুল নয়। এ হল অন্য মিতুল। আগেকার দিনে কঠিন রোগ হলে মানুষ হাওয়া বদল করতে যেত। হাওয়া বদলের পর সে সুস্থ হয়ে ফিরত। তখন সে হয়ে যেত সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ। মিতুলও তোমাদের বাড়িতে এসে যেন হাওয়া বদল করে গেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা রহিম স্যারের চোখে তখন টলমল করছে আনন্দাশ্রু।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুভ ঘুড়ি ওড়া দেখছিল। আকাশে অনেকগুলো ঘুড়ি উড়ছে। এদিকে সামনেই বিশ্বকর্মা পুজো। শুভ একমনে ভাবছে। তার খুব ইচ্ছে করছে মাঠে গিয়ে একটু ঘুড়ি ওড়াই।

আকাশের বুকে ছোট ছোট সাদা মেঘ বেশ আনন্দে উড়ে যাচ্ছে। শরতের মেঘ বলে কথা। শুভ্র পেঁজে তুলোর মত মেঘ।

আসলে শুভকে গৃহ বন্দি হয়ে থাকতে হয়। একটার পর একটা শিক্ষক আসছে আর যাচ্ছে । শুভর বাবা ও মা দুজনেই চাকরি করে। বাড়িতে দু'জন মাঝবয়েসি কাজের লোক রয়েছে। তাদের কাছ থেকে শুভর আড়াল হবার উপায় নেই। তারা শুভকে সারাদিন নজের নজরে রাখে। শুভর বাইরে যেতে ইচ্ছে হলেও নানা টানাপোড়েনের মধ্যে বাইরে যেতে পারে না।

শুভ একমনে ছাদের রেলিং -এ বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি ওড়া দেখছে। শুভর মা এসে বলে, শুভ এখনই অঙ্ক স্যার আসবেন নিজের ঘরে চলে যাও। আমাকে যেন ছাদে এসে ডাকতে না হয়। রবিবার একটি দিন ছুটি পাই, বিশ্রাম আর হয়না।

মাঠের দিকে একবার তাকিয়ে শুভ নিজের ঘরে চলে এল। ঘরে এসে জানালা দিয়ে শুভ মাঝে মধ্যেই বন্ধুদের খেলা দেখতে লাগল।

শুভর অঙ্ক স্যার ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ আড়াল থেকে শুভর অবস্থা দেখলেন। অঙ্কের স্যারকে দেখে শুভ পড়তে বসে গেল। কিন্তু অঙ্ক করার সময় একটার পর একটা অঙ্ক ভুল করতে লাগল। স্যার বুঝতে পারলেন এই বিকেলে সবাই খেলছে। আর তাদের খেলা দেখে শুভ পড়ায় মনোযোগী হতে পারছে না।

শুভর অঙ্ক স্যার শুভর বাবাকে বলেছিলেন যে তিনি শুভকে বিকেলে না পড়িয়ে রাতে পড়াবেন। যাতে শুভ বিকেলে খেলাধুলো করতে পারে। কিন্তু শুভর বাবা তাতে রাজী হয়নি।

শুভর মা চা হাতে ঘরে ঢুকলে স্যার বললেন, শুভ আজ অকটাও অঙ্ক করতে পারছে না। এ কথা শুনে শুভর মা তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিল। তা দেখে স্যার বললেন, আপনি জানালাটা বন্ধ করে শুভর মনটা কি অন্য দিকে সরিয়ে দিতে পারবেন ? যে সময়ে যা করা দরকার তাই করা উচিত। শুভর বয়স মাত্র এগারো। এই শৈশবে ওর খেলাধুলোটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিমধ্যে শুভর বাবাও ঘরে এসে ঢুকেছে। বাবা বলল, মাষ্টারমশাই আপনি আগামীকাল থেকে শুভকে রাত্রেই পড়াতে আসবেন। আর শুভ প্রতিদিন বিকেলে একঘন্টা করে খেলবে।

কথাটা কানে যেতেই শুভর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

শুভর অঙ্ক স্যার বললেন, দেখবেন এবার থেকে শুভকে আর লেখাপড়ার কথা বলতে হবেনা। কেন জানেন ? কারণ খেলাধুলো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একধরণের মেডিসিন।

খেলাধুলো

সুচিত চক্রবর্তী

স্কুল ড্রেস - তাও আবার আজ ? কেউ পরে না। ছেলেদের গায়ে রঙিন শার্ট, টি শার্ট। মেয়েরা পরেছে ফ্রক, টপ, ক্যাপ্রি। সমস্ত বাচ্চাদের গায়েই আজ পার্টি ড্রেস। আজ অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবে যে। স্কুলের গেটের পাশেই ঠেলায় করে বিক্রি হচ্ছে আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিংক্স আর চিপস্। দেয়াল ঘেঁসে বেলুনওয়ালা দাঁড়িয়ে। বেলুনের মতই সবার আশা আকাঙ্খা উড়ছে আকাশের পানে। খুদে খদ্দেররা কিনছে এটা ওটা। আসল ভিড়টা হবে রেজাল্ট বেরুবার পরে ।

অটো থেকে নামতে নামতে সাত্বত বল্লে, " জানিস আমার ড্যাডি তো কখনো ইউকেজিতে পড়েইনি।"

"আর আমার ড্যাডি নাকি সোজা ক্লাস টুতেই ভর্তি হয়েছিল। তখন নাকি ইউকেজি এলকেজি ছিলই না। কী মজা !" হাতের ওয়াটার বটল্‌টা গলায় ঝোলাতে ঝোলাতে পিনাকিও রাস্তায় নেমে এল।

আজ দুই বন্ধুর ইউকেজির রেজাল্ট বেরুবে। এরপর ক্লাস ওয়ান। নার্সারী থেকে স্কুলে। জীবনের হার্ডেল রেসের আরেকটা বাধা অতিক্রম করা।

বাচ্চাদের ভিড় ঠেলে যেতে যেতে পিনাকি বলল, "এই তো কিছুদিন আগে বাপির অফিসে কী জানি কী টেস্ট হল। ভগবান জানে এ কী রকম পরীক্ষা - যার রেজাল্ট বেরোয় না।"

"মা বলছিল অফিসের পরীক্ষায় পাস হলে নাকি মাইনে বেড়ে যায়। বড়দের তো মজাই মজা। আমাদের তো রেজাল্ট যত ভালোই হোক না কেন, সেই মা'র কাছেই ক্যাডবেরিসের জন্য বায়না করতে হয়।"

ভিড়ের মাঝে দু'চারজন বন্ধুর সাথে দেখা- "হাই, তোর বাবা বিকেলে কোথায় নিয়ে যাবে রে ? "

সাত্বত পিনাকির শার্টে টান দিল, "ঐ দেখ অধিতি। হবে তো ফার্স্ট নিশ্চয়ই। কিন্তু মুখটাকে এমন হাঁড়ির মত করে রেখেছে, যেন ফেলই হয়ে গেছে। আর ওই দেখ ওর মাকে, বটগাছতলায় বসে চোখ বুজে জপ করে যাচ্ছে। সার্কাস হচ্ছে যেন।"

রেজাল্ট

অমিতাভ শঙ্কর রায় চৌধুরী

"আমারো ভয় কচ্ছে রে, সাত্বত।" পিনাকির মুখে মেঘ।

"আরে দূর ছাই। আগে রেজাল্টটা তো বেরুতে দে। পিছলে পড়ার আগেই ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবি নাকি ?"

"ম্যাথ দেখলেই মাথাটা যেন ম্যাড হয়ে যায়। বাবা শাসিয়ে রেখেছে এবারো যদি ম্যাথ খারাপ হয় তো মামাবাড়ি যাওয়াই ক্যান্সেল !"

"ড্যাডিদেরও যেন আর কোনো কাজ নেই। ছেলেদের দেখলেই ঢাক পেটাতে ইচ্ছে করে। মায়েরাই ভালো।"

"আসলে মায়েরাও যে নিজেদের ছেলেবেলায় ম্যাথটাকেই ভয় পেতো।" দুই বন্ধুতে হসে উঠলো।

ঢং ঢং ঢং ইতিমধ্যে প্রেয়ারের ঘন্টা বেজে উঠলো। তারপর বক্তৃতা... নম্বর একটু কম পেলে মন খারাপ করবে না। জীবনের প্রত্যেকটা দিনই তো একেকটা পরীক্ষা। বুকে বল আনো। মনে সাহস রেখো। নেকস্ট সেশনে আরো ভালো করে পড়াশোনা করো। তাহলেই তো রেজাল্ট আরো ভালো হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর ? ক্লাসের ভেতরে বুক দুরদুর। শেষ পর্যন্ত হাতে রেজাল্ট। ম্যাডামের ভ্রুকুটি। অবশেষে দুই বন্ধুতে আবার বাইরে বেরিয়ে এল।

হাতে রেজাল্ট কার্ড পেতেই পিনাকির নজর সবচাইতে প্রথমে ম্যাথের নম্বরে। কত পেলাম ? চোখ দুখানি ছল ছল করে উঠলো।

"আরে হলটা কী বলবি তো" সাত্বত বন্ধুর কাঁধে হাত রাখে।

"নতুন কী আর হবে ? যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। ম্যথেই খারাপ নম্বর।"

সাত্বত ভারী ভাবনায় পড়ে গেল। কী করা যায় ? বন্ধুর জন্য বুকের ভেতরটা ভারী টনটন করছে। হঠাৎ পিনাকির কাঁধটায় হাত দিয়ে তার কানে কানে বল্ল, "অ্যাই পিনাকি, একটু চল তো আমার সাথে।"

"আমি ? কোথায় ? আমার কোথাও যেতে ভাল্লাগছে না।"

"আরে বাবা, চলই না। দেখই না কী হয়।"

দুই বন্ধুকে দেখতে পেয়ে ম্যাথ টিচারের ঠোঁটের ফাঁকে হাসি, "কী ব্যাপার মানিকজোড় একসাথে যে।"

"ম্যাম", সাত্বত ম্যাডামের কাছটিতে গিয়ে দাঁড়াল। "ম্যাম, পিনাকিকে আমার মার্কস থেকে অর্ধেকটা দিয়ে দিন না। আলাদা করে ওর জন্য আমরা কিছু চাইছি না। ম্যাথের এই নম্বর দেখলে ওর বাবা ওকে খুব বকবে, তাই।..দেখুন না..বেচারা কাঁদছিল। ওটা পেলে ও কতই না খুশি হবে। প্লিজ ম্যাডাম, আমার মার্কস থেকেই ওকে অর্ধেক নম্বর দিয়ে দিন না...।"

পুজোর ঢাক

বদ্রীনাথ পাল

তাক কুড়াকুড়, তাকুড় নাকুড়, তাক কুড়াকুড় তাক
শিশির মেখে শরৎ এলো বাজলো পুজোর ঢাক।
মেঘ সরে ওই আকাশ খানি হলো নীলে নীল
ভাসছে সেথায় মেঘের ভেলা আর ওড়ে শাঁখচিল।

তাক ধিন তাক, তাক ধিন তাক, তাক ধিন তাক ধিন,
মনের মাঝে আগমনীর সুর বাজে রিন রিন।
টইটম্বুর ভরা দিঘি ঢেউ নাচে ছল্ ছল্
শাপলা-শালুক করছে খেলা, হাসছে শতদল।

তাক ডুমা ডুম, তাক ডুমা ডুম, তাক ডুমা ডুম, ডুম
মা আসছেন বছর পরে, লাগলো খুশির ধুম।
আনন্দেতে শিশিরকণা ঝরছে ঘসের পরে
শাখায় শাখায় শিউলিরাশি সাজানো থরে থরে।

তাক কুড়া কুড়, তাক কুড়াকুড়, তাক ধিন তাক তা
এলো পুজো এলো পুজো তাইরে নাইরে না,
সবুজ মাঠের আলে আলে হাসছেরে ওই কাশ
বান ডেকেছে খুশির রে ভাই, এলো আশিন মাস।

ভ্রমণ

সুপ্রকাশ আচার্য

ঠিক করেছি গ্রীষ্মে এবার যাবই রাজস্থান
পূর্ণিমাতেই সেরে নেবো জ্যোৎস্না ধারায় স্নান।
সোনা বালির চিকন পথে উটকো কাঁটা গাছ
উটের পিঠে দেখব বসে মরিচীকার নাচ।
বর্ষা এলে চেরাপুঞ্জি মৌসিনরাম গ্রাম
আসবো ঘুরে নৌকা করে হ্রদটি উমিয়াম।
জোঁকের মুখে চুন দেবো আর সাপের কানে মন্ত্র
পান্থপাদপ পাতায় রেখে বৃষ্টি মাপক যন্ত্র
শরৎ কালে সুন্দরবন নয়তো নেহাত মন্দ
হোগলা বনে বাঘের গায়ে বুনো বুনো গন্ধ।
হেমন্তে এই লক্ষ্মী ছাড়ার উদাস অনুভূতি
ঝার্টিঙ্গাতে দেখব বসে পাখির আত্মাহূতি।
শীতে এবার আসব ঘুরে কেদার অমরনাথ
বরফ যদি পথ আটকায় দেখব তুষারপাত।
প্রয়োজনে রুকস্যাকটাই নেব কাঁধে তুলে
আসব ঘুরে লে ও নাদাখ নতুবা কার্গিলে।
বসন্তে আর কোথায় যাবার নেবো না ভাই নাম
শিমুল পলাশ শাল মহুয়ায় স্বর্গ আমার গ্রাম।

এই সমস্যাটা বহু পুরনো। বলতে গেলে পৃথিবীতে মানুষের জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যান্ত আর মরা মানুষের সমস্যা। একদিকেতো জ্যান্ত ভূত আর মরা ভূতের বিষয় নিয়ে মানুষ কোনও সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পায়নি। জীবিত মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলেও সেই মানুষকে মমি করে রাখা হয়েছে আর সেই মানুষের সঙ্গে রাখা হয়েছে জীবিত মানুষ এবং তাদের খাওয়া পরার জন্যে নানান জিনিস। আর এই সবই রাখা হয়েছে সুরক্ষিত জায়গায়। কখনও পিরামিডে আবার কখনওবা পাহাড়ের গুহায়। জীবিত মানুষরা মনে করেছে যে এতদিন যে মানুষটা চলেছে ফিরেছে খেয়েছে খেলেছে ঘুরেছে তাদেরই সঙ্গে সে কোথায় যাবে ? সে তো ফিরে আসবেই। আর এই চিন্তাই অন্য এক জগতের কথা সেখানকার মানুষ পশুপাখির কথা পৃথিবীর মানুষকে ভাবতে শিখিয়েছে। কিন্তু তবুও কত কিছুই অজানা থাকে। সমস্যা মেটেনা।

এসব ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ধরার জোগাড়। আর তখনই চোখে পড়ল সিনেমা পরিচালক আলফ্রেড ডিচকক-এর পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময়কার শেষ কথা, "শেষটা সবারই এত অজানা ! তাই মরে গিয়েই জানতে হয়, মৃত্যুর পর কী ঘটে।"

কিন্তু এই দুই দুনিয়ার মধ্যে বেশি ফারাক নেই। এক অদেখা লাইনে যেন এই দুই জগতকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। জ্যান্ত ভূত আর মরা ভূত অথবা ঘুরিয়ে বলতে গেলে জ্যান্ত মানুষ আর মরা মানুষরা সবসময়ই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলেছে। সেই যোগাযোগ রয়েছে কোনও চিহ্ন বা কোনও সংকেতের মাধ্যমে। প্রাচীন রোমে মৃত পূর্বপুরুষদের খাবার আয়োজন করা হত আর খাওয়ার জন্যে নির্ধারিত সময় শেষ হলেই চার্চের ঘন্টা বাজিয়ে দেওয়া হত। সেই ঘন্টা বাজানোর মধ্যে জানান দেওয়া হত "ঘোস্ট অব্ মাই ফাদারস নাউ গো অ্যাওয়ে।"

জ্যান্ত ভূত আর মরা ভূতের সমস্যা

চুনীলাল রায়

এই ঘন্টা বাজিয়ে কিছু জানানোর মানেই হচ্ছে দেখা আর এদেখা জগতের মধ্যে খবর বিনিময় আদান প্রদান করা।

এই রকম অভিজ্ঞতা আরো ভালোভাবে হয় যখন গয়াতীর্থে হিন্দুরা তাদের পূর্বপুরুষদের নামে পিণ্ড দিতে যান। মহালয়ার দিন পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা বা জলদান করা থেকে মনে হয় পূর্বপুরুষরা সত্যি সত্যিই জল নিতে আসেন।

ইসলামধর্মীরাও পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। শব-এ-বরাত এর দিন পবিত্র গোরস্থানে গিয়ে পূর্বপুরুষদের জন্যে প্রার্থনা করা হয়। ভোজ্য সামগ্রিও উৎসর্গ করা হয়। সেই সঙ্গে বরাত মানে ভাগ্য দেবীকেও আহ্বান করা হয়।

আমি খুব মন দিয়ে হাতে ধরা খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিলাম। পড়তে পড়তে আমার চোখ গেল খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের লৌকিক বিশ্বাস আর আচার আচরণের দিকে। লেখা রয়েছে অল সেন্টস ডে পয়লা নভেম্বর। অল হ্যালোস। আর হ্যালোউয়ীন ডে হচ্ছে তার আগের দিন অর্থাৎ ৩১ শে অক্টোবর। কোনও নির্দিষ্ট সন্তকে স্মরণ করার জন্যে ছিল সেন্টস ডে। আর খৃষ্টধর্মের সমস্ত সন্তদের স্মরণ করার দিনটি হল অল সেন্টস ডে অল হ্যালোস ডে। যে দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শ্রদ্ধা ভক্তি পবিত্রতা আর ঈশ্বর সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার শপথ নেবার দিন হিসাবে।

আমি পড়া থামাই। একটু সময়ের জন্যে। তারপর আবার পড়তে থাকি। সত্যিকথা বলতে কী হ্যালোউয়ীন হচ্ছে অল হ্যালোস ইভিনিং কথাটার সংক্ষিপ্ত শব্দ। যে দিন সমস্ত মৃতদের স্মরণ করা হয়।

কিন্তু প্রথমেই ইংল্যান্ডে আর পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই দিনটিতে আরো কিছু মজা আরো কিছু রহস্য রোমাঞ্চ ও ভীতি সঞ্চারের ব্যবস্থা করা হয়।

যেমন ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু হল ট্রিক অর ট্রিট খেলার প্রবণতা। ইউনাইটেড কিংডমে। যখন উৎসাহী জনগণ বিভিন্ন সাজপোশাকে সেজে উঠত আর খাদ্যর বিনিময়ে কবিতা আবৃত্তি বা গান শোনাত। তবে এই সাজপোষাকটা অনেক সময়ই হত তাদের ছদ্মবেশ। আসলে এই ট্রিক হচ্ছে কৌশল বা চালাকি করে তামাশা অথবা প্রতারণা করে লোককে ঠকানোর এক মজার খেলা। এর ফলে যাকে বা যাদের ঠকানো হচ্ছে তারাই পানীয় বা খাদ্য খাবার দিয়ে ঐসব ছদ্মবেশিদের আপ্যায়ন করেন।

কিন্তু একসময় এইসব ব্যাপারে অনেক বদল ঘটে গেল। ১৯৩০ সন নাগাদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দোকানে আত্মপ্রকাশ করল ট্রিক্ অর ট্রিট উৎসবের নানান বিচিত্র আর রকমারি পোশাক আর সাজগোজ। এইসব পোশাকের বিশেষত্ব হল সেগুলি কিম্ভূত কিমাকার ও উদ্ভট ধরণের। কেননা এগুলো তৈরি করা হয় ভূত প্রেত কঙ্কাল বা রক্তশোষক পিশাচের আদলে। কলকাতার সদর স্ট্রিট, মির্জাগালিব স্ট্রিট আর ধর্মতলার অনেক দোকানে এই পোশাক এখন পাওয়া যায়। কিম কারদাশি আন আর হেইদি ক্লাম নানান অদ্ভূত সাজে সেজে দর্শকদের কখনও ভয় দেখান আবার আনন্দও দেন।

আমি লেখার শেষটুকু এবার পড়তে থাকি। সে বছর হাওড়ায় অক্টোবরের ১৪ তারিখের হ্যালোউয়ীন পার্টি শুরু হয় আর কোনও কোনও জায়গায় এই পার্টি চলে ডিসেম্বর অবধি। কলকাতা নিউমার্কেটের নাসিম, আসিফ আর আমির এই সমস্ত পার্টির ব্যবস্থাপক। তবে বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে এইসব পার্টি জমে ভাল।

আমি পড়া শেষ করি। একটু বারান্দায় পায়চারি করি। এখান থেকে বেলান্দুর লেক স্পষ্ট দেখা যায়। যেমন দেখা যায় ওপাশের ওমশক্তি মন্দির আর লেকের ওপাশে এয়ারফোর্সের বিরাট এরিয়া।

আমি ভাবি বেঙ্গালুরুর এই অঞ্চলে তো সবই অ্যাপার্টমেন্ট। এখানে বোধহয় ঐসব পার্টির চল নেই। এমন সময় কলিংবেল বেজে ওঠে। আমি দরজা খুলি। দেখি আমাদের মুখোমুখি ফ্ল্যাটের খুশবু। ওর স্বামী দীপঙ্কর আমার ছেলে রাজর্ষির সহকর্মী।

আমি ওকে দেখে হেসে বলি, কী হল ? ভূত চতুর্দ্দর্শী, কালীপুজো, বড় দেওয়ালি, ছোট দেওয়ালি, মায় গোবর্ধন পুজো। তোমরাতো এখানে সবই ভালোভাবে করলে আর কী বাকি ?

খুশবু আমার কথার জবাব দিল না। কেবল একটু হেসে বললে, আন্টি কোথায় ?

ওদিকে আসমানী খুশবু-র গলার আওয়াজ পেয়ে সামনে চলে এসেছে। আর ওরা এরপর নীচুস্বরে কীসব কথা বলে চলে। তারপর খুশবু এবার ফিরে চলে। যেতে যেতে হেসে বলে, আঙ্কেল আজ রাতেই দেখবেন কী হয়। কেমন মজা হবে। কত ভূত প্রেত কঙ্কাল গরিলা প্রজাপতি স্পাইডার ম্যান লাল মুখো ডাইনি গাই ফকস সব এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। কথা বলবে। ওদের জন্যে খাবার রাখবেন।

আমিতো খুশবু-র কথা শুনে অবাক। বলে কী ? এতো ভূত-রা আসবে ? এরা কি ঘোস্ট অব্ মাই ফাদারস ? আমার মাথা ঘুরতে থাকে। আরে খুশবু শেষে যেন কী বলে গেল ? হ্যাঁ ওদের জন্যে খাবার রাখবেন ? কিন্তু ওরা কি খাবে ? সব ভূত পেত্নী গরিলা প্রজাপতি সবারই কি একই খাবার ? আমরা ছোটবেলায় যে সব ভূত পেত্নীর কথা শুনেছি তারাতো মানুষের হাড়গোড় কড়মড় করে চিবিয়ে খেত। রক্ত খেত। জ্যান্ত মানুষকে খেত। এরাও কি তাই করবে ?

এসব মনে হতেই আমার খুব ভয় হওয়া শুরু হল। আমার চোখমুখ শুকিয়ে গেল। তারপর সারাদিনই আমার খুব চিন্তায় চিন্তায় গেল। ভালো করে খেতেও পারলাম না। কাউকে যে কিছু জিজ্ঞাসা করব তারও উপায় নেই।

বাড়ির সবাই দেখলাম খুব ব্যস্ত। ওরা যেন আমাকে এড়িয়ে চলতেই ব্যস্ত। তবে সন্ধের একটু আগেই দেখলাম রাজর্ষি তার বউ পারুল আর মাকে নিয়ে বের হল। যাবার আগে আমাকে বলে গেল, আমরা না আসা পর্যন্ত কেউ [illegible] দরজা খুলবে না। কেননা দরজা খুলে খেতে না দিলে ওরা কিন্তু কেলেঙ্কারি কাণ্ড করবে। সেজন্যে সাবধানে থেকো। আমরা আসছি সব ব্যবস্থা করে।

ওদের অমন সব কথাবার্তায় আমি মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে যাই। এখন মনে মনে রাম রাম জপ করা ছাড়া আমার বাঁচার পথ আর কোথায় ?

তবে ভাগ্য ভালো। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ওরা ঘুরে এল। আমি ওদের হাসি হাসি মুখ দেখে বেশ স্বস্তি পাই। ওদের সবার হাতে বেশ কটা প্যাকেট। মনে হল ওতে চকোলেট, টফি, বিস্কুট রয়েছে।

আমি দরজা বন্ধ করতে গেলাম। কিন্তু রাজর্ষি মানা করে বলল, বাবা দরজা খোলাই থাক।

আমি ওর কথা শুনে অবাক হলাম। কিন্তু কিছু [illegible] আমরা এবার চা-টা খেতে খেতে কথা [illegible]

আর এবার ঘটল সেই বিশ্রি কাণ্ড। হঠাৎ করে লোডশেডিং দেখলাম শুধু আমাদের ঘরই নয় আশেপাশের বিরাট একটা এরিয়া অন্ধকার ঢেকে গেল। আর শুধু তাই ? [illegible] থেকে এক গণ্ডা কুকুর বেড়াল এসে ডাকতে শুরু [illegible] তো নয় যেন মরা কান্না জুড়েছে। ওদিকে আবার [illegible] বেহালায় করুণ এক সুর বাজানো শুরু করল। আবার [illegible] থেকে ভেসে এল ড্রাম ঢাক ঢোলের আওয়াজ।

এসব শুনে ভয়ে আমার আত্মারামতো খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড়। সত্যি সত্যি ভূত প্রেতের আসা শুরু হল নাকি ? এবার কি শুরু হবে তাদের খেতে চাওয়া ? কিন্তু কোথা থেকে দেব সে সব ? কিছুই তো ঘরে নেই। তবে ? [illegible] কি আমার ? আমাদের ঘাড় মটকাবে ?

এসব ভাবনা আমার শেষ হবার আগেই দেখি ঘরের মধ্যে দশ-বারোজন ছেলে মেয়ে ঢুকে পড়েছে। তাদের [illegible] ভূতের মুখোশ। কেউ বা সেজেছে কঙ্কাল। মা [illegible] রক্তচোষা বাদুড়।

আমি কিছু বুঝে উঠবার আগেই ওরা দেখি টেবিলের ওপর রাখা চকোলেট টফি তুলে নিয়ে পকেটে পুরতে শুরু করেছে।

আমি বাচ্চাগুলোর কাণ্ড দেখে অবাক। আর একটু পরেই ওরা বেরিয়ে যেতে দেখি আমাদের ঘরে দীপঙ্করদের [illegible] এল। তাকিয়ে দেখি ওদের দরজায় রয়েছে জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন আর আমাদের দরজায় লাগানো রয়েছে [illegible] বিরাট এক ছবি।

আমি হাসি এসব দেখে আর ভাবি জ্যান্ত আর মরা [illegible] এবার বোধহয় মিটবে। সবাই যে একই।

এবার পুজোয়

কাজল দাস

গতরাতে ফোন করে বলেছে মাসি মেসো
খোকন এবার দুর্গাপুজোয় মোদের বাড়ি এসো
পড়া নেই টিউশান স্কুল তোমার বন্ধ
ক'টা দিন কাটিয়ে গেলে লাগবে না তো মন্দ।

শোনার পরে বলল বাবা পরের বছর যাবে
দুর্গাপুজো দেখার এমন অনেক সময় পাবে।
পুজোর পরে কোচিং আছে, একাদশীর দিনে
জুতো-বল-ব্যাট-প্যাড কাল এনেছি সব কিনে।

অনেক কষ্টে বিখ্যাত ওই কোচকে রাজি করে
হাজার পাঁচেক টাকা তাকে দিয়েছি তলে ধরে
তাই এবার ক্রিকেট আর মন দিয়ে পড়ো
দুর্গাপুজো অনেক পাবে আগে জীবন গড়ো।

আমার রোজ নামচা

নিতাইচন্দ্র রজক

নির্ভী কুমারী আমি পড়ি ইস্কুলে
আমার রোজ নামচা শোনো সকলে,
পড়ার ঘরে বসে রোজ পড়া সারি
চান করে খেয়ে নি রুটি তরকারি।
দশটায় মা আমাকে তুলে দেন বাসে,
টা-টা দেখিয়ে মা ঘর ফিরে আসে,
বিকেলে সেই বাসে ফিরে আসি ঘর
নিজের গাড়ি চালাই সহেনা যে তর।
মা আমার ড্রেস খুলে আগে দেন খেতে
খাওয়ার পরই খেলি সংসার পেতে।
খেলনাপাতি নিয়ে দিন বেলাবেলি
পশু পাখি খেলনা সব নিয়ে খেলি।
পাতা লাইনে বেশ চলে রেলগাড়ি
বউ হতে মন যায় পরি তাই শাড়ি
দিদিমণি সাজলেই আমি খুব কড়া,
পুতুলদের বকা দিই ধরি সব পড়া।
কাজ থেকে বাপিও ঘর ফিরে আসে
কোলে নেয় চুমু খায় খুব ভালোবাসে,
রাতে ডিনার সেরে হাত মুখ ধুই
দু-চোখ জড়ায় ঘুমে বিছানায় শুই।

ছোটদের পাতা

ভূতনাথ

সোহিনী নন্দী (২য় শ্রেণি)

ভূতনাথ নাম তার
গায়ে ময়লা জামা
মাথায় তার পাকা চুল
হাতে বড় ধামা।
রাতে আসে প্রতিদিন
গ্রামের ঘরে ঘরে
ধামা ভর্তি ফলমূল
দেয় থরে থরে।
দরজা খুলে দেখে সবাই
কে দিয়েছে ফল ?
মানুষ নেই, ভাবে সবাই
এ হল ভূতেরই ছল !

বাঁশবাগানের ভূত

তনুব্রত সরখেল (২য় শ্রেণি)

একজন মানুষ খুবই গরিব ছিল। তার টাকা নেই। সে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার তো টাকা নেই তাই সে একদিন বাঁশবাগানে গিয়ে বলতে লাগল, হে ঠাকুর তুমি আমাকে সুস্থ করে তোল। হঠাৎ একটা ভূত তার কথা শুনতে পেয়ে বলল, তুমি কে ? লোকটি বলল, আমি একজন গরিব মানুষ। ভূত এরপর তাকে সুস্থ করে দিল ও বেশ কিছু সোনা ও টাকা দিল। ভূত বলল, এবার থেকে আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব। মানুষটা বলল, নিশ্চয়ই। এরপর তারা সবাই একসাথেই থাকতে লাগল।

হারবে না পরীক্ষাসুর

প্রবাহনীল দাস (২য় শ্রেণি)

জানুয়ারির শেষ। পরীক্ষা খুব কাছে। ক্লাসের সবাই খুব চিন্তিত, কারণ পরীক্ষার সিলেবাস জানা নেই। রাগে মাথা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, বলে কিনা সারপ্রাইজ টেস্ট !

এখন এই বিপদ থেকে কে বাঁচাবে ? হঠাৎ মনে হল একটু ফেয়ারি টেল্স পড়ি। চুপি চুপি ব্যাগ থেকে নিয়ে বই খুলতেই সবাই বই থেকে বেরিয়ে এল। ফেয়ারি গডমাদার, লিট্‌ল মারমেড, পিনোচিও, বিউটি, বিষ্ট, সিনড্রেল্লা, স্নো হোয়াইট আর সেভেন ডোয়ারফ্স। সবাই একসঙ্গে বলে উঠল– মন খারাপ করোনা, আমরা সবাই তোমাদের সাথে আছি।

হঠাৎ ছুটির বেল বেজে গেল ক্রিং ক্রিং। সবাই একে অপরের সঙ্গে স্কুলের বাইরে এলাম। পরামর্শ করার পর আমরা সবাই বাড়িতে যাব। কিন্তু হঠাৎই গলা পেলাম পিনোচিওর। সে বলল – কোথাও যেতে হবেনা। বলতেই ব্যাগ থেকে তালির শব্দ শুনতে পেলাম এবং দেখলাম আমরা চলে এসেছি 'ফেয়ারি ল্যান্ড' ! দেখতে পেলাম আবার ওরা সবাই বইয়ের বাইরে চলে এসেছে। কিন্তু ওরা বাইরে আসেনি বরং আমরাই এখন বইয়ের ভিতর।

আমরা সবাই ঠিক করলাম কাল পরীক্ষার সময় আমরা পরীক্ষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে হারিয়ে দেব। সবাই বলল যে তারা আমাদের তাঁবুতে থাকবে। সূর্যদীপ ও অরিজিৎ হবে আমাদের দূত। আমি হব কম্যান্ডার, সৈন্যরা হবে সৌম্যদ্যুতি, উপলক্ষ, উজান, প্রায়াঙ্কশু, অভ্রজ্যোতি, পিনোচিও, বিষ্ট ও সেভেন ডোয়ারফ্স। আমাদের মধ্যে কেউ আহত হলে ফেয়ারি গডমাদার তো আছেই। পরেরদিন টেস্ট, তাই সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। সকালে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বীর যোদ্ধার বেশে। সামনেই বাস-স্টপেজ। সেখানে আমরা দাঁড়ালাম। আমরা অপেক্ষা করছিলাম হাওয়াই বাসের জন্য যার মধ্যে পিকাচু, বাটারফ্রি, পিজিওট, বাল্‌বাসর, স্কোয়ার্টেল, চারিজর্ড, স্নোরল্যাক্স, ল্যাপ্রাস, কিংলার, মাক প্রাইমেপ, চিকোরিটা, স্টারিড, স্টার্মি, গোল্ডি, হর্সি... পোকেমন আছে। তারাও আমাদের সাহায্য করবে।

সামনে স্কুলে ঢুকতেই যুদ্ধ করতে শুরু করলাম সবাই। অনেক চলল যুদ্ধ। প্রায় সব পরীক্ষাই অজ্ঞান আর আহত হল । শুধু অঙ্ক পালিয়ে গেল। তবে বেশিদূর না, অনেক্স শিঙে করে গুঁতিয়ে নিয়ে এল। তারপর ফেয়ারিরা তাকে আচ্ছা ধোলাই দিল। ভয়ে ভয়ে সে বলল যে তারা আমাদের আর অসময়ে বিরক্ত করবে না। কিন্তু সন্ধি হয়েছে কী হয়নি মা ঘুম থেকে টেনে তুলে বলল, – তা খুব বলেছিলে যে ফেয়ারি টেল্স না পড়ে পড়তে বসবে। এই তার নমুনা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে দেখি আমি পড়ার চেয়ারে বসে। টেবিলের ওপর খোলা ফেয়ারি টেল্স। যা বাব্ বা। পুরোটাই স্বপ্ন। তবে তো সারপ্রাইজ টেস্টটা দিতেই হবে।

মায়াবতীর মাথায় বাস্তব বোধ বুদ্ধি একটু কম ছিল। কিন্তু মনে সাহস ছিল। অন্তরে ভালবাসা ছিল। প্রাণে দয়া-মায়া ছিল। কিন্তু অচিরেই তা শেষ হয়ে গেল। এই মায়াময় দুনিয়া ছেড়ে অকালে তাকে চলে যেতে হল। কথাটা মনে পড়লে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে কৃষকের। হাপরের মত ওঠা-নামা করে তার বুক। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই দৃশ্য। দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলছে তাদের সাধের বাড়ি। কুন্ডলি পাকিয়ে ভাসছে একরাশ কালো ধোঁয়া। পাটকাঠির মত বাড়িটা এক এক করে ভেঙে পড়ছে জ্বলন্ত অঙ্গারে। ধারে কাছে থেকেও সকলে সর্ষে ফুল দেখছে চোখে। এমন সময় কে যেন বলে উঠল- মাম্পিকে দেখছিনা, সে গেল কোথায় ?

মাম্পির কথা শুনে টনক নড়ে মায়াবতীর। সে তো ঘরের ভিতর ঘুমচ্ছে। তাই কাল বিলম্ব না করে, কোন বাধা বিপত্তি না শুনে মায়াবতী দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। সবাই গেল গেল রবে চিৎকার করে উঠল। কিছুক্ষণ পরে ফিল্মি নায়িকার মত মেয়েকে বুকের মধ্যে নিয়ে বাইরে এল। অনেক সেবা-সুশ্রুশায় বেঁচে গেল মাম্পি। কিন্তু সকলকে ছেড়ে পরপারে চলে গেল মায়াবতী। সত্যি মায়াবতী একদম বোকা ছিল। মাথায় যদি তার একটু বোধবুদ্ধি থাকত তাহলে কি নিজের প্রাণের বিনিময়ে একটা দত্তক নেওয়া মেয়েকে বাঁচাতে যেত ?

বুকের মধ্যে আজও কষ্ট অনুভব করে কৃষক। পলে পলে অনুভব করে মায়াবতীর অনুপস্থিতি। আক্ষেপে ভরে ওঠে তার মন। তাকে একাকী রেখে কেন সে অকালে চলে গেল ? দেখতে দেখতে পনেরটা বছর গড়িয়ে গেল। মাম্পি এখন অনেক বড় হয়েছে। তার নিজেরও বয়স অনেক বেড়েছে। তবু মায়াবতী আজও বেঁচে আছে তার হৃদয়ে। তার মনের অন্দরে। আর তাদের পালিত মেয়ে তাকে নিজের পিতা ভেবে আজও সেবা করে চলেছে।

পরপারে গিয়ে কি শান্তিতে আছে মায়াবতী ? বোধহয় না। সে নাকি আজও মাম্পিকে চোখে চোখে রেখেছে। আজও নাকি তাকে শাসন করে চলেছে। তার কোন অসুবিধে হলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কথা মাম্পির মুখেই শুনেছে কৃষক। মাকে স্মরণ করলেই মা নাকি তার কাছে আসে। কথাটা কতখানি সত্য, কতটা অসত্য তা কৃষক জানে না। মায়াবতীও তার সামনে এসে কখনো দাঁড়ায় নি।

কৃষক শুনেছে অপঘাতে মৃত্যু হলে মানুষ ভূত হয়। তাহেল মায়াবতী নিশ্চয়ই ভূতেদের দলে ভিড়েছে। কিন্তু ভূত হয়ে কি সে তার আচার - আচরণ, স্বভাব সব ত্যাগ করতে পেরেছে ? বোধ হয় না। তা যদি হত, তাহলে মাম্পির প্রতি এত দয়া মায়া তার থাকত না। নিশ্চয়ই ভূতেদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তাদের নিয়ে অনেক গল্পগাঁথা প্রচলিত আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মায়াবতী মাম্পির সঙ্গে দেখা করে, অথচ তার সঙ্গে করে না। তার মনের কথা জানতে চায় না। চাষ করার জন্য মাটি কোপাতে কোপাতে এইসব কথা ভাবছিল কৃষক। গা দিয়ে তার দরদর করে ঘাম ঝরছিল। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার। কৃষক একটু বিশ্রাম নেবার কথা ভাবছিল। এমন সময় শুনতে পেল এক অপার্থিব গলা। - "তুমি গিয়ে গাছের তলায় বসো। জমিটা আমি কোপাবার ব্যবস্থা করছি।"

কৃষক এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। তবে কন্ঠস্বর ছিল এক নারীর। খুব সম্ভবত মায়াবতীর। কিন্তু মায়াবতী এখানে আসবে কোথা থেকে ? সে তো মারা গেছে। তাহলে কি সে ভুল শুনেছে ? নাকি মাম্পির কথাই ঠিক। মাকে স্মরণ করলেই মা তার কাছে আসে। সেও তো মায়াবতীর কথা স্মরণ করছিল। তাই কি মায়াবতী

মায়াবতীর মায়া

সৈয়দ রেজাউল করিম

তার কাছে চলে এসেছে, তাকে সাহায্য করার জন্য। কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। তবে মায়াবতীর কথা মতো কাজ ছেড়ে সে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসল। আর নানান চিন্তাভাবনা করতে থাকল।

কিছুক্ষণ পরেই গায়ের ঘাম জুড়িয়ে গেল কৃষকের। সে তার কোদালটা নিয়ে মাঠের কাছে গেল। সেখানে গিয়ে হতবাক হয়ে গেল সে। কেউ কোথাও নেই অথচ শ'দুয়েক কোদাল তার জমির মাটি খুঁড়ে চলেছে। কোথা থেকে এইসব কোদালগুলো এল, কারা সেই কোদাল চালাচ্ছে তা সে বুঝতে পারল না। অবশেষে সে বুঝতে পারল, এগুলো ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার। মায়াবতী নিশ্চয়ই তার সঙ্গী-সাথিদের দিয়ে এইসব কাজ করাচ্ছে।

সে কাজ পাঁচ মানিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। তা দেখে খুব খুশি হল কৃষক। মায়াবতী পরপারে গিয়েও তাদের মায়া যে ভুলতে পারেনি তা হাড়ে হাড়ে টের পেল। বাড়ি অভিমুখে রওনা দেবার সময় আবার শুনতে পেল মায়াবতীর গলা –"জমি কোপানোর কাজ শেষ। তুমি তাড়াতাড়ি বীজ নিয়ে এসো।"

ঘরে ফিরে মায়াবতীর কথা বলতে যেতেই মাম্পি বলল, "মা আমাকে সব বলেছে। কাল তুমি গমের বীজ কিনে নিয়ে এসো। আর মায়ের জন্য একটু সুঁটকি মাছও এনো।"

জীবিতকালে মায়াবতী খুব পছন্দ করত সুঁটকি মাছ। কিন্তু সে নিজে তা পছন্দ করত না। এই নিয়ে মাঝে মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাদানুবাদ চলত। কিন্তু মাম্পির মুখে সুঁটকি মাছের কথা শুনে একবারও মুখ বেঁকালো না। কৃষকের মনে হল, পরপারে হয়তো সুঁটকি মাছ পাওয়া যায় না, তাই তার সাধের খাবার খেতে চেয়েছে। তাই মেয়ের কথার জবাবে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "ঠিক আছে। তাই হবে। তবে মাছটা রান্না করে ঘরে রেখে দিও'। মাঠে নিয়ে গেলে সকলে মিলে টানা-হ্যাচড়া করতে পারে।"

পরদিন ছিল হাটবার। কৃষক হাট থেকে সুঁটকি মাছ আর গমের বীজ কিনে নিয়ে এল। মেয়েকে মাছ রান্না করার কথা বলে গমের বীজ নিয়ে মাঠে গেল। সেগুলো ছড়াতে গিয়ে শুনতে পেল মায়াবতীর গলা।

"বীজগুলো জমির আলে রেখে দাও, আমি ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।"

দু-ধামা গমের বীজ দু'মিনিটেই সারা জমিতে ছড়িয়ে দিল মায়াবতীর সাথি ভূতেরা। শুধু তাই নয়, জমিতে ফেলা বীজ যাতে পশুপাখিরা খেয়ে না ফেলে, নষ্ট করে না দেয় তার জন্য পাহারা দিতে থাকল। যদিও তাদের কাউকে চোখে দেখতে পেল না কৃষক, তবে বুঝতে কোন অসুবিধে হল না তার। আশে পাশের জমিতে কাক শালিকরা ধান, গম খেয়ে গেলেও তার জমিতে ঢোকার সাহস পেল না।

দু-তিন দিন যেতে না যেতেই বীজ গম ফুটে অঙ্কুর বার হল। সেই অঙ্কুর ধীরে ধীরে গাছ হল। গাছের গোড়ায়, আশেপাশে আগাছা জন্মাল। সেগুলো ভূতেরা নিড়িয়ে দিল। গাছ যাতে তেজী হয়, ফসল ভালো হয় তার জন্য জল, সার, বিষ প্রয়োজন মতো ছড়িয়ে দিল। দেখতে দেখতে দুটো মাস কেটে গেল। গমের গাছে এলো শীষ। মৃদুমন্দ হাওয়াতে তা দুলতে লাগল। দেখে খুব আনন্দ হল কৃষকের। মায়াবতীকে ধন্যবাদ জানাবার খুব ইচ্ছে হল। মরে গিয়েও সে তাদের জন্য কত উপকার করছে। আর পাঁচটা দয়াহীন, মায়াহীন ভূতের মত সে নয়। আসলে যে যেমন মানসিকতার লোক, সেই মানসিকতা ফুটে ওঠে তার পরলৌকিক জীবনে।

কয়েকদিন পরে মাম্পিকে নিয়ে কৃষক গেল গমের ক্ষেত দেখতে। গমের পুরুষ্ট শিষ দেখে প্রাণ ভরে গেল তাদের। এবছর ক্ষেতে ভালো গম পাওয়া যাবে। সারা বছরের খাবারের জন্য তাদের চিন্তা করতে হবেনা, বেশি হলে বেশ কিছুটা বেচেও দেওয়া হবে। তাই গমগুলো ঠিকমত পুরুষ্ট হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য একটা গমের শিষ থেকে দুটো দানা বার করে মুখে দিল। এমন সময় শুনতে পেল মায়াবতীর গলা। কৃষককে উদ্দেশ্য করে সে বলল, "গম গালে ফেলে কী দেখছ ?"

কৃষক বলল, "গমগাছগুলো কেটে এখনই ঝাড়াই মাড়াই করা যাবে কি না তা জানতে দুটো গম চিবিয়ে দেখছি পুরুষ্ট হয়েছে কিনা।"

মায়াবতী বলল, "ও তোমাকে দেখতে হবে না। তুমি মাম্পিকে নিয়ে গাছের তলায় বসো, আমি দেখছি। "

এরপর মায়াবতী কাকে কী বলল তা কৃষকের জানার কথা নয়। কিন্তু গাছতলা ছেড়ে জমির কাছে ফিরে গিয়ে সে "হায় হায় আমার কী সর্বনাশ হল" বলে মাথা চাপড়াতে থাকল। তার গমের শিষগুলোতে একটাও গম নেই। মায়াবতী নিশ্চয়ই তার সাথীদের বলেছিল, একটা দুটো গমের দানা চিবিয়ে দেখতে, গম পুরুষ্ট হয়েছে কী না। কিন্তু তার সাথীরা তো একজন দু'জন নয়। অনেকজন । তারা একটা দুটো করে দেখতে গিয়ে সব গম শেষ করে ফেলেছে। আক্ষেপ করে তাই কৃষক বলল, "মায়াবতী ! তুমি এ কী কাজ করলে। পরপারে গিয়েও কী এরকম ভুল করতে থাকবে। এখন আমরা কী খেয়ে বাচব ?"

মাম্পি বলল, "বাবা। মাকে তুমি কিছু বলো না। মনে কোন দুঃখ রেখোনা। আমার মায়ের নাম মায়াবতী। তার প্রাণে অনেক দয়া মায়া। তিনি আমাদের সাথে আছেন থাকবেন। ঈশ্বরের কৃপায় সব ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি। "

ঘরে ফিরে কৃষক দেখল উঠোন জুড়ে থরে থরে রাখা আছে শুধু গম আর গম। তা দেখে কৃষক মনে মনে ভাবল, যাক মায়াবতীর বোধবুদ্ধি তাহেল আগের মতো আর নেই। ভূতের দল তার ক্ষেতের গম খেয়ে ফেলেনি। মায়াবতী যত্ন করে সব পৌঁছে দিয়ে গেছে তার উঠোনে !

টেলিগ্রাফ্ - আজ তুমি হিমঘরে

[illegible]তিকণা মুখোপাধ্যায়

[illegible] হ্যাথ্ গড় রট
এই হল প্রথম বার্তা
[illegible]য়েল প্রেরক কর্তা
[illegible] ছিল টরে-টক্কা।
[illegible]খেছি শুনেছি পড়েছি —
[illegible] এখন ভাবতে বসেছি,
[illegible]-কাহিনি ছিল জড়িয়ে
[illegible]-নিয়েছ তুমি মুখ সরিয়ে
[illegible] এনেছে ই-মেল, এস এম এস
[illegible] তুমি হিমঘরে শেষ।

[illegible]বি আঁকা

[illegible] মণ্ডল

[illegible] গোটা আকাশ আঁকবো তারায় তারায় ভরা
[illegible] রেখায় উঠবে ফুটে সুখের দিনে গড়া।

[illegible] পথের ছবি আঁকবো কৃষ্ণচূড়ার সারি
[illegible] ভাতে রাঙা পথে সূর্য দেবে পাড়ি।

[illegible] নদীর ছবি আঁকবো ঢেউ উথালি পাথালি
[illegible] একটা নৌকা হবে যেন চাঁদ এক ফালি।

[illegible] আসছেন

[illegible]প চৌধুরী

[illegible] ফুলেরা দোলায় মাথা মেঘ-তুলোরা ওড়ে
[illegible] বছর পরে আবার মা আসছেন ঘরে।
[illegible] রোদ খেলার ছলে খুশির হাওয়া মেখে
[illegible] জুড়ে রামধনু রং দিলই দেখি এঁকে।
[illegible] খুশিতে তাল মিলিয়ে মাছরাঙাটি এসে
[illegible] খবর জানান দিতে দূরে গেল ভেসে।
[illegible] নিয়ে ফুলের সুবাস ছড়িয়ে দিল দোরে,
[illegible] বছর পরে আবার মা আসছেন ঘরে।

খুশির ছড়া

শ্যামাচরণ কর্মকার

গাছ বলল, ছায়া ছড়াই
পাখি বলল, গান
বন বলল, ছড়াই সবুজ
ফুল বলল, ঘ্রাণ।

মাঠ বলল, বিলোই খুশি
মাটি বলল, সৃষ্টি
আকাশ বলে, নীল আঁকি আর
মেঘ বলল বৃষ্টি।

সূর্য বলে, রোদ এঁকে দিই
দিন বলল, আলো
চাঁদ বলল, জোছনা মাখাই
রাত বলল, কালো।

মা বলল, ঝরাই স্নেহ
শিশু বলল, হাসি
বলল শুনে বসুন্ধরা —
এটাই ভালোবাসি!

আমার আকাশ

প্রদীপকুমার সামন্ত

আমার আকাশ ভরে গেছে লক্ষ তারার খুশির মেলা
কান্না-হাসির দোদুল দোলায় ভাসাই মধুর ছেলেবেলা।
জীবন মাঝে বিভেদ ভুলে সব জাতিকে এক করি
মায়া-মমতা কন্ঠে ঢেলে আপন করে জড়িয়ে ধরি।
যাক্ দূরে যাক্ দূরে সরে হিংসা বিবাদ জ্বালা যত
খুশির কলি উঠুক ফুটে মন বাগিচায় অবিরত।
শান্তির বানী দিই ছড়িয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে,
দীন দুখী আর্ত সেবায় মন্ত্র ভরুক সব অন্তরে।

ঝালাপালা

তাপস চক্রবর্তী

পটকা ফাটে বাজি ফাটে কান যে ঝালাপালা
দুর্গা বলে হাসির ছলে, মর্ত থেকে পালা।
কার্তিক বলে ময়ূর কোথা ? পালিয়ে গেল ভাই,
গণেশ বলে, আমার বাহন নাচছে- তাইরে নাইরে নাই।

পুজো মানেই
মনোরঞ্জন গরাই

পুজো মানেই খুশি আর
পুজো মানেই মজা
পুজো মানেই নতুন কাপড়ে
পাড়ার মন্ডপে সোজা।

পুজো মানেই ফুচকা আর
পুজো মানেই সন্দেশ
পুজো মানেই সকলের পাশে
থাকবেই আমার নিজের দেশ।

পুজো মানেই ঠাকুর দেখা
পড়ে নেওয়া ম্যাগাজিন
পুজো মানেই পুজোর ছুটিতে
বেড়িয়ে আসা লন্ডন-চীন।

পুজো মানেই পুজো নয়
শুধু তোমারই জন্য
পুজো মানেই পুজো তাদেরও
যারা একেবারে নগণ্য।

শরৎ আসে
উদয়ন হাজরা

শরৎ আসে শরৎ আসে
ওই তো শরৎ আসে,
সবুজ ঘেরা নীল দিগন্তে
প্রকৃতি তাই হাসে।

শিউলি-মালতি-টগরফুল
ফুটেছে গাছে মেলা,
আনন্দেতে শিশুরা তাই
করছে মাঠে খেলা।

ঢ্যাম কুড় কুড় বাদ্যি বাজে
সুর ভেজে যায় দূরে,
আকাশে বাতাসে ওঠে ঢেউ
আগমনীর সুরে।

সম্পর্ক
নয়নতারা

বলতে শুনি ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
মধুর সম্পর্কটাই নাই।
বাঘের চোখে আগুন ঢেলে
ঘর পোড়ালি তাই।

মন পুড়ছে বন পুড়ছে
পুড়ছে সবার ভালোবাসা
চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়ে
অসাধু আর নোংরা ভাষা।

ভুলে নাই যাই - স্বর্গাদপী গরীয়সী
মা আর মাটি,
ভাই-বোনের স্নেহ যেন
সোনার চেয়েও খাঁটি।

গণেশদাদার বাহন
তরনী পাত্র

গণেশদাদার পেটটি হাঁড়ি
লাড্ডু খান কাঁড়ি কাঁড়ি।
বাহনটি তার কম কিসে,
নেংটি ইঁদুর তার পিশে।
কাটুর কুটুর লেপ কাঁথা
আস্ত যে নেই বই-খাতা।

উট চলেছে
মানস দরিপা

উট চলেছে মুখটি তুলে
মরুভূমির দেশে
জল না খেয়ে বাঁচে বহুদিন
বোঝা বয় অক্লেশে।

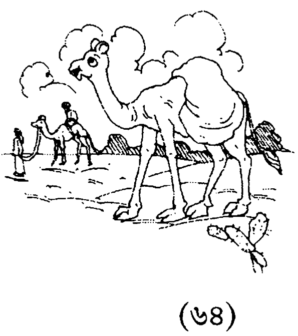

রূপকথার দেশ
বিধান শীল

রূপকথা চাই, রূপকথা চাই
ও ছোট্ট মেয়ে ?
সব কিছু ফেলে, চোখটি তুলে
দ্যাখ একবার চেয়ে।
পক্ষীরাজে চেপে, তেপান্তরে নেমে
অচিনপুরের দেশে,
বইপত্তর ছুড়ে, মনটা সবুজ করে
চলে যা রাজকন্যা বেশে।
সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি
মায়াবী এক জাদুর দেশে,
দত্যি-দানব, রাক্ষস-খক্কোস
ঘুম পাড়াবি গানের শেষে।
ও ছোট্ট মেয়ে, এখনো তুই চেয়ে
ব্যাঙমা ব্যাঙমিরে
দেখতে পাবি, কান্ড কত আজগুবি
পড়া পড়া খেলা, কাটছে তোর বেলা
খেলবি যা রাজপ্রাসাদে,
রাজার দাস-দাসী, ময়নামতীর হাসি
মন ভরবে আহ্লাদে।
গোমড়া মুখে, কীসের দুখে
কেন আছিস অমন বেশে ?
সঙ্গী করে, হাতটি ধরে
নিয়ে যাবো তোকে রূপকথার দেশে।

দুষ্টু ছেলেরা
নূপুর সরখেল

একজন ঝাঁপ মারে খাট থেকে মেঝে,
আর জন মজে থাকে কুরকুরে লেইজে।
ইস্কুলে যাবে না সে করবেই পণ,
চকোলেট দাও শুধু বলে সারাক্ষণ।
একজন সাইকেলে দেখায় ম্যাজিক,
হাত ছেড়ে বলে দেখো - কু-ঝিক ঝিক্,
তারপর পড়ে গিয়ে হাত মোচকায়,
তাতে নেই পরোয়া, কে ভয় পায় ?
ভাই চড়ে পিছনে দাদা ড্রাইভার,
ঠামা দাদু বকে বকে মেনে গেছে হার।
অনিক-বানিক তোরা পড় এই বেলা,
সন্ধ্যে বেলায় ঠিক যাবো রাসমেলা।

[illegible]মের বাড়ির ঠিকানা
[illegible]নকুমার বিজলী

[illegible] দিঘির পাশে শাপলা শালুক হাসে,
[illegible] গেলেই আমার বাড়ি ঘেরা সবুজ ঘাসে।

[illegible] সুপারি গাছে সারি দিয়ে আছে
[illegible]-ঘুঘু খেলা করে চড়ুই ছানায় নাচে।

[illegible] ধরে আলে হাঁটতে হবে তালে
[illegible] বেতাল হও যদি ভাই পড়বে গিয়ে খালে।

[illegible] তুমি যেতে ? নিশানা ঠিক পেতে
[illegible] ধানে ভরে আছে চারিদিকের খেতে।

[illegible]লিয়ায় আসুন
[illegible] পাল

[illegible] পুরুলিয়ায়
যা খুশি তাই নেবেন,
[illegible]-ঝুমুর-ছৌ
এ কে ফর্টিসেভেন।

ক'জন প্যারেন্টস জানে
শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী

মাগো। সেদিন বন্ধু আমায় বললো এসে, বোকা।
বৃথাই তোকে সবাই বলে ইতিহাসের পোকা।

আমি বলি, মিথ্যে নাকি ? সব থেকে তো বেশি
ইতিহাসেই প্রাপ্তি আমার, তাই তো রেষারেষি।

বলতো তবে ভারত নামের দেশটি কবে থেকে
এমন ধারা নামটি পেল কারণটি কী দেখে।

আমি তখন জবার খুঁজে মরছি যথা তথা,
বন্ধু বলে, না মাকি তার শোনায় এ সব কথা।

বাবা ও তার শোনায় কত বলবো তোমায় কীযে
হা করে সব গল্প গিলি লজ্জা ঘামে ভিজে।

পুরাকালের গল্পকথা অনেক নাকি দামি
জানো যদি শোনাও না গো ধন্য মানি আমি।

পরীক্ষাতে আসবে এসব ? কী আছে এর মানে ?
আর্জি মায়ের, দ্যাখ গে খুঁজে ক'টা প্যারেন্টস জানে।

[illegible]পুরের খোঁজে
[illegible] বসু

[illegible] রাস্তায় কেউ চলছে না।
[illegible]. পথ অন্ধকার।
[illegible] কোথাও আলো জ্বলছে না।
[illegible] বন্ধু নীলু জোরে জোরে পা চালাই।
[illegible] মাঠ ছেড়ে তাড়াতাড়ি করে পালাই।
[illegible] ডাকল পেছন থেকে
[illegible] ডাকে ? কাজ নেই তাকে দেখে।
[illegible] গিয়ে আমার পায়ে ফুটল কাঁটা,
[illegible] দেখি তোর পা- টা ।
[illegible], বললাম অত করে —
[illegible] পথ চল। ঠিক আছে, ভয় নেই, আয় —
[illegible] জ্বলে, দূরে কুঁড়েঘর দেখা যায়।

[illegible] গেছি, পীঠ থেকে ব্যাগ নামা,
[illegible] থাকেন মেজোমামা।
[illegible] কারো জল পাই কী না দেখে আসি,
[illegible] লোকেদের দেখে মনে হয় চাষিবাসি।

ঐ তো পুটুস বনের ধারে ধারে
কে হেঁটে যায় আধো-অন্ধকারে ?
চল তাকে গিয়ে ধরি...
রাতটা কোনমতে এ গ্রামে কাটাব, দু'জনে অনুরোধ করি।

ওরে নীলু এটাই কুসুমপুর,
যে গ্রামের খোঁজে এসেছি রে এতদূর।

আর ঐ দ্যাখ গায়ে হাতকাটা জামা
ঐ তো আমার মেজোমামা।
চটপট প্রণামটা সেরে
সোজা চলে যাই ঘরে।

দিদা দেখে কত খুশি হবে বল।
তাড়াতাড়ি চল, তাড়াতাড়ি চল...

আমার দাদা

অরিজিৎ পাত্র

শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়ল শেষমেশ। প্রথম দিকে সব দেখে শুনে সকলে বলাবলি করছিল, আর বুঝি সেভাবে শীত এলোনা এবার। কিন্তু ডিসেম্বরের মাঝ বরাবর সব হিসেব উলটে পালটে শীত তার মরণ কামড় দিতে এসেই গেল। বছরের শেষ হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, চারদিকে কেমন পিকনিক পিকনিক গন্ধ। সবার মনই কম বেশি উড়ুউড়ু হয় এসময়। তার ওপর আবার স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষাও শেষ। রেজাল্ট বেরোতে বেশ কয়েকদিন বাকি। এটাই তো সময়, বাবা মায়ের হাত ধরে টুক করে কোথাও থেকে একটু ঘরে আসা। কিংবা সপ্তাহ খানেকের প্ল্যান করে একটু দূরে কোথাও . . .। নিদেনপক্ষে মামার বাড়ি, মাসির বাড়ি, পিসির বাড়ি তো আছেই।

আমার অবশ্য এসবের কোন বালাই নেই। পড়াশোনার পাঠ চুকেছে সেই কোন কালে। তাই পরীক্ষা বা রেজাল্টের টেনশনও নেই। যাইহোক একটা ছোটখাট চাকরিও জুটে গেছে তারপর। তবে বছরের এই শেষ কটা দিনের হাতছানি এড়ানো খুব কঠিন। দু'এক দিনের ছুটি জোগাড় করে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়তেই হবে আমাকে। কেমন যেন একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এটা। ছোটবেলায় এই সময়টা বাবা-মা-দাদার সাথে সিমলা, দার্জিলিং, গোয়া, পুরী.. কত জায়গাতেই না ঘুরেছি। এখন অবশ্য সেইসব দিনের কথা মনে করলে শুধু কষ্টই পাই। জীবনের সব সুন্দর মুহূর্ত বোধহয় চিরস্থায়ী হয়না।

এবারও তাই সুযোগ করে চলে এলাম দীঘা। এই নিয়ে এটা আমার দ্বিতীয়বার দীঘা আসা। আমি পশ্চিম মেদিনীপুরের এক গ্রামের ছেলে। তবে, বাড়ি থেকে খুব দূরে না হলেও এর আগে মাত্র একবারই এসেছি এখানে। সেটাও গতবছর, আমার বড়দার সাথে। গতবারের সেই কয়েকটা দিন আমার চিরদিন মনে থেকে যাবে। চাইলে কী আর সবকিছু ভুলে যাওয়া যায় ? তবে এবার এসেছি একা।

মেন রোডের পাশে কালীমন্দিরের উলটো দিকে পূর্বাশা হোটেল। ওল্ড দীঘার একমাত্র

এই হোটেলটা আমার চেনা। গতবারও এখানেই ছিলাম [illegible] সেই সূত্রে চেনাজানা। একেবারে সমুদ্রের কাছে না হলেও চারতলার ব্যালকনি থেকে দিব্যি সমুদ্র দেখা যায়। [illegible] থেকে রুম বুক করে আসিনি। এখন তো সবাই মোবাইল [illegible] হোটেলের রুম বুক করে ফেলে। আমি আবার এইসব [illegible] সম্পর্কে একেবারেই অশিক্ষিত। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে [illegible] গিয়ে দাঁড়াতেই হোটেলের ছেলেটা একগাল হেসে [illegible] একদম ঠিক সময়েই এসেছেন দাদা। যদি আপনি [illegible] মিনিট আগে আসতেন, তবে বলতাম কোনো রুম [illegible] নেই। কিন্তু এখুনি কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক ফোন [illegible] বুকিং ক্যানসেল করলেন। তবে ডবল বেডের রুম। [illegible] একটু বেশি পড়বে। সিঙ্গেল বেডের কোন রুম ফাঁকা [illegible] বুঝতেই পারছেন এখন পিক সিজন।”

আমি হেসে ঘাড় নেড়ে বললাম, “আমার কোন [illegible] নেই।” রিশেপসনের ছেলেটা এবার অন্য একজনকে [illegible] বলল, “বাসুদেব, এই স্যারকে ৪০৩ নম্বর রুমটা [illegible]

[illegible] সেই ৪০৩ নম্বর রুম ? অজান্তেই একটু [illegible] গেলাম যেন। সেবারও তো আমরা এই ৪০৩ নম্বরেই [illegible] সবকিছু কেমন যেন একই আছে আজও। দাদাই [illegible]

হোটেলের ছেলেটা দরজা খুলে দিতেই এক নিমেষে [illegible] গতবছরের ঠিক এই দিনটাতে। বাবা মায়ের [illegible] এখন আর আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে ঘুরে [illegible] পারেন না। তাই তিন দিনের ছুটি জোগাড় করে [illegible] চলে এসেছিলাম দীঘায়। দাদা বয়সে আমার চেয়ে বছর [illegible] বড় হলেও, আমার সাথে বন্ধুর মতই মিশত। তাই [illegible] বেড়াতে বেরোলেও মজার অভাব হত না।

ছেলেটা জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিতে শীতকালের [illegible] ভরে গেল ঘরটা। এক লহমায় মনে হল অতীতের [illegible] ফিরে এলাম বর্তমানে। যদিও দিনের আলোয় [illegible] কেমন যেন অচেনা লাগে আমার আজকাল। সেই [illegible] সব একই আছে এখনও। একবছরে কিচ্ছু [illegible] শুধু আমি...

[illegible] এই ঘরে বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারব [illegible] বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায় ওল্ড দীঘাতে [illegible] ভিড় একটু বেশি থাকে। আর এখন ক্রিসমাসের [illegible] সেই ভিড় দশগুন বেড়ে গেছে। চারদিকে অসংখ্য [illegible] সবকিছু দেখে আমার পুজোর সময় কলকাতার [illegible] মনে পড়ে যাচ্ছিল। যদিও পুজোর ভীড়টা মূলত হয় [illegible] এখানে তো দিনরাত সারাক্ষণ একইরকম।

একটু এগিয়ে বাঁদিকে সরু গলি বরাবর দু-মিনিট [illegible] বিস্তৃত বঙ্গোপসাগরের নীল হাতছানি। আর [illegible] লোকজন থিকথিক করছে। হৈ হৈ করে [illegible] স্নান করছে। কেউ কেউ তো দলবেঁধে সেই জলের ওপরেই বল লোফালুফির খেলা খেলছে। আমার আবার শীতকালে জল ঘাঁটাঘাঁটি করতে বরাবরই অনীহা। আর এখন তো এসবের প্রশ্নই ওঠেনা। আমি তাই অন্যদিকে মন দিলাম। সমুদ্রের গায়েই তাঁবু খাটিয়ে ডাব বিক্রি হচ্ছে। ওদের পাতা চেয়ারে বসে সমুদ্রের ঢেউ দেখতে লাগলাম। কাছেই সি বীচে সাজানো ঘোড়ায় চড়ে নানান কায়দায় ছবি তুলছে অনেকে। চারদিকে কত রকমের দোকান। খাওয়ার জিনিস আর গিফটের দোকানই বেশি। সবকিছুরই দাম এখানে আকাশছোঁয়া। তবুও রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে। চারপাশে সবকিছু দেখতে মন্দ লাগছিল না। মাঝেমাঝেই পুরনো কথাগুলো মনে পড়ছিল।

হঠাৎ একটা হৈ চৈ এর শব্দে সম্বিত ফিরল। তাকিয়ে দেখি একটু দূরে জলে একটা সাতাশ আঠাশ বছরের ছেলে হাবুডুবু খাচ্ছে। বন্ধুদের সাথে স্নান করছিল সম্ভবত। ছেলেটার বন্ধুরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে কিন্তু কেউ সাহস করে এগিয়ে আসছে না। তাকিয়ে দেখলাম চারপাশে একজনও পুলিশ কিংবা সিভিক পুলিশ চোখে পড়ল না। অথচ এই ভিড়ের সময় তাদের বেশি বেশি করে থাকা উচিত। একবছর আগের সেই দুঃসহ স্মৃতি ভিড় করে আসছে মাথায়। আর বেশি ভাববার সময় নেই। আশেপাশের সবাইকে চমকে দিয়ে ঝাঁপ দিলাম জলে। গ্রামের ছেলে, সাঁতারটা মন্দ জানিনা। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ছেলেটাকে নিয়ে উঠে এলাম। পেটে কিছুটা জল ঢুকে জ্ঞান হারালেও বেঁচে আছে। ওর হৃদস্পন্দনের শব্দ নিশ্চিত করল আমাকে।

চারপাশে লোকজন এখন ভীড় করে আমাকে দেখছে। অনেকেই এগিয়ে এসে পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেল আমার। আর ঐ ছেলেটার বন্ধুরা কৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। সবার ক্যামেরা আর মোবাইল ক্যামেরা এখন আমার দিকে ঘোরানো। ছবি তুলছে আমার। ক্রিসমাসের ছুটিতে বেড়াতে এসে এমন একটা দুঃসাহসিক কান্ড ক্যামেরা বন্দি করে নিতে চায় সবাই। বাড়ি ফিরে সবাইকে প্রমাণ সহ গল্পটা বলা যাবে তাহলে।

কিন্তু আমি জানি, ওদের একজনেরও ক্যামেরায় আমার ছবি থাকবে না। চারপাশের সবকিছু থাকবে। শুধু আমিই থাকবো না। অশরীরীর আবার ছবি কী ? আমি বরং মন দিয়ে সেই ছেলেটাকে দেখছি। দাদার সাথে কেমন যেন মুখের মিল আছে ছেলেটার।

গতবার দাদাকে বাঁচাতে পারিনি। স্নান করতে গিয়ে এভাবেই সমুদ্রের জলে তলিয়ে গেছিল দাদার শরীরটা। সেবারও দাদাকে বাঁচাতে আমি ঝাঁপ দিয়েছিলাম জলে। উত্তাল সমুদ্র দাদার সাথে আমাকেও টেনে নেয় নিজের কাছে। আজ ঠিক একবছর বাদে কেউ বেঁচে উঠল আমারই হাতে। নিজের দাদাকে সেদিন বাঁচাতে পারিনি। কিন্তু কারো দাদা কিংবা ভাইকে আজ বাঁচাতে পারলাম। মৃত্যুর পরেও অন্তত এটুকুই সান্ত্বনা থাক আমার...

নীল তোতার ডাকাডাকিতে গোলপাতার কুটিরে জেগে উঠলো উদাস বুড়ো।

“ওঠো বুড়ো, ওঠো, ওঠো।”

বুড়োর সাদা চুল দাড়িতে তোতাপাখি ঝটপট করতে করতে বলল।

বুড়ো পাশ ফিরতেই আবার বকাবকি।

“কী হলো ? সূয্যিমামার রাগ বেড়ে যাচ্ছে। পাতার শিশির শুকিয়ে যাচ্ছে। আর তোমার ঘুম ভাঙলো না ?”

উদাসবুড়োকে এবার উঠে বসতেই হল। সূর্যের আলো ঢুকছে পাতার জোড়ের ফাঁকে ফাঁকে। বুড়ো বাইরে এল। উড়ে এসে তোতা বসলো কাঁধে। বুড়োর পাতার ঘরের দরজা সর্বদা জঙ্গলের সবার জন্য খোলা। ঝড় বৃষ্টি ছাড়া সেটা বন্ধ হয়না।

বুড়ো একটা বড় কাঁঠাল গাছের নীচে এসে দাঁড়াল। প্রচুর কচুগাছের গলাগলি তার তলায়। শিশিরের বিন্দু ঝকমক করছে পাতায় পাতায়। কাঁধ থেকে উড়ে নীল তোতা বসল ডালে। বুড়ো দু'হাত মেললো পাতাগুলোর নীচে। পাতারা একসাথে নুয়ে পড়ে জলে ভরিয়ে দিল বুড়োর হাত - বার কয়েক। বুড়ো চোখমুখ ধুয়ে এসে দাঁড়াল লতা ঝোপের পাশে। শশাজাতীয় নানা ফল ঝুলে ঠেকেছে মাটিতে। দু'চারটি ছিঁড়ে কচকচাকচ চিবোতে চিবোতে চলল বড়ো। এসে দাঁড়াল এক্কেবারে বনের প্রান্তে।

লালচে সরুপথ চলে গেছে এঁকে বেঁকে দূরে। বুড়ো পথে উঠল। পথের দু'ধারে কখনো বা ঘন গাছের সারি। কখনও বা দূরে পাথুরে টিলার হাতছানি। বুড়ো দাঁড়াচ্ছে না। হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় তুলে দেখল সূয্যি এখন এক্কেবারে মাথার ওপর। কপালের ঘাম মুছলো কোমরের সাথে বাঁধা গামছা খুলে। মনে হল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া শরীর জুড়িয়ে বয়ে গেল। চোখে পড়ল পথের ধারে জমি ঢালু। সেদিক এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেল সরু এক

পালকপাতা ও স্ফটিক ফুল

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় দাস

কি অপূর্ব গোলাপী তার রং। উদাস বুড়োর চোখ … জলের কাছে এসে পা ডোবাল। নীচু হয়ে … নিয়ে দিল ঘাড়ে মুখে। তারপর ভারী আরামে … ওপর। জলে ভাসছে এক অচেনা ফুল — … স্বচ্ছ কাচ হিরের মত আভা তার।

উদাস বুড়ো এক লম্বা গাছের নীচে শুয়ে ঘুমিয়েই … আরামে। হঠাৎ খেয়াল হল, তাই তো। যাচ্ছি … কাছে, ভাগ্নীর মেয়ের বিয়ে, অর্থাৎ কিনা … বলে কথা। খালি হাতে কি যাওয়া চলে ! … এক জমিদার কুমার নাকি নাতজামাই হতে … তার অপরূপ সুন্দরী। এসব খবর বুড়োর … এক কাপাস তুলো ভাই। বুড়োর নাতনি … দিন সাতেক আগে। তুলো ভেসে ভেসে … এসে খবর দিল বুড়োকে। তাই তো বুড়ো … দেখতে।

… কথা মাথায় আসতেই বুড়ো উঠে বসল। … তার আগে মোলাকাত হয়নি কখনও। … বলেছে, তার নাকি খয়েরী রেশমের মত … ঘাড়ের কাছে ঝোলে – চুলে যদি টান দাও … গোড়ালি। ছেড়ে দিলে যেই কে সেই। … গোলাপফুলের পাপড়ি চটকে রং করে কেউ … করেছে। আর চোখ . . . চোখের কথা যেন … ? বুড়ো মাথা চুলকোয়। সত্যিই সে বুড়ো … থাকে না।

… জলের দিকে চেয়ে ভাবল, এত সুন্দর … নাতনিকে দেওয়া এক দারুণ উপহার হতে … গুটিয়ে গোলাপি জলের মধ্যে নেমে … গেল গোছা গোছা ভাসমান ফুলের … দু'হাতে গোছা করে ছিঁড়ে তুলল অনেক …

… পায়ের কাছে কি যেন একটা সুড়সুড়ি … তেই খিলখিল হাসি। বুড়ো ভ্যাবাচাকা … জলে ভেসে উঠল পুচকে একটা মাছ। … সূর্যের রং।

… উদাস বুড়ো, ও ফুল তো এমনি তাজা … গোলাপি নদীর জল ছেটাতে হবে।"

… কী হবে ? নাতনি পালকপাতার হাতে … কী তবে শুকিয়ে যাবে ফুল।

খিক খিক করে হেসে উঠল মাছ। "কী আর হবে, … আমি এক পেট জল খেয়ে তোমার … শো পা যাবো আর থুথু ছেটাবো ফুলে। … রাখা হয় গোলাপ জলে আর আতর … পাত্রে তবে তো আর কথাই নেই। … হয়ে জ্বলে থাকবে এই ফুল অনেক …

বুড়ো হাঁফ ছেড়ে বলল, "তাই বলো। তবে তো তোমাকে গামছায় বেঁধে ঝুলিয়ে নি গলায়।

মাছ তখন এক পেট জল খেয়ে ঝুলে থাকল বুড়োর গলায়। আর থেকে থেকে জল দিতে লাগল স্ফটিক ফুলে।

চলতে চলতে ঢুলুনি এসে যাচ্ছে। পাহাড়ে লাল ফুলেরা মেতে উঠেছে। আশেপাশে ঝিরঝিরানি হাওয়া জুড়িয়ে দিচ্ছে শরীর। বুড়ো বলল, "একটু জিরাই মহুল তলায়।"

"না গো বুড়ো না, আমার পেটের জল ফুরিয়ে যাবে যে। বেতোয়াবোনা গ্রামে যাই চলো আগে।"

গ্রাম আর বেশি দূর না। তবে নীলকণ্ঠের বন পেরিয়ে যেতে যেতে কাপাস তুলোর আর এক ভায়ের সঙ্গে দেখা আবার।

"উদাসবুড়ো, তোমারই খোঁজে চলেছি। তোমার নাতনির বড় বিপদ।"

"বিপদ" শুনেই বুড়োর হাত থেকে ফুল টুল সব পড়ে যায় আর কী !

কাপাস যা বলল, তা শুনে বোঝা গেল জমিদার কুমার সুকমল ময়ূর রথে চড়ে আসছিল বনপথে শোওড়াডোবার জটাবুড়ি ময়ূররথ সমেত আটক করেছে সুকমলকে। জটাবুড়ি পোষা সাপদের একখানাকে ময়ূর পথের মাঝে সাবাড় করেছে। সেই রাগে বুড়ি আড়াল থেকে ঘুমফাঁস ছুড়ে আটক করেছে তাকে। তাহলে বীর সুকমলকে ধরার সাধ্য ছিল কী তার । তারপর অবশলতার রসে ঢেলেছে। সুকমলের বোকা চাহনি নিথর দেহ– ভেসে আছে শেওড়াডোবার ঠিক মধ্যিখানে, বুড়ির পোষ্য কুমিরের পিঠে।

শুনে মাছ বলল, "সাহস রাখো বুড়ো। তুমি প্রাচীন মানুষ, তুমি যদি সাহস হারাও, তোমার ভাগ্নীর বাড়ির লোক কী করে ? বেচারা নাতনিই বা করে কী। চল আগে নাতনির কাছে।"

বেতোয়াবোনা ছোট্ট গ্রাম। বড় শান্তশিষ্ট । লড়াই ঝগড়া নাপসন্দ সবার। তাই খবরটা পেয়ে সবাই দমে আছে। পালকপাতা সবার বড্ড প্রিয়।

পালকপাতার হাতে ফুলগুলো তুলে দিতে দিতে উদাসবুড়ো বুঝতে পারল, সে দুঃখ পেয়েছে বটে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি। পালকপাতা বিদুষী, সে জানে সমস্যাতে একটু শক্ত হতে হয়।

সুকমলের বাবা জমিদার ক্ষীরকদম এখন রাজার হয়ে লড়তে গেছেন পুবতারায়। ফলে বেচারা সুকমলের সৈন্যসামন্তও নেই। " না হলে ঐ জটাবুড়িকে মেরে কুচিয়ে ফেলাই হত যোগ্য শাস্তি।" মাছ বলে বসল।

চোখ বুজে ঘাড় নাড়ল বুড়ো। রক্তপাত বড় জঘন্য ব্যাপার। একমত পালকপাতাও। কিন্তু শাস্তি দিতে হবেই বুড়িকে। উদ্ধার করে আনতে হবে প্রিয় সুকমলকে। বুড়োর মনে হল এসময় তোতাকে চাই। নীলতোতা জানে জল জঙ্গলের নানা গোপন কথা। ডান হাতে একটা ঘাসের টুকরো

তুলে নিয়ে দখিন দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ডাক দিল বুড়ো জোরে জোরে–

"নীলচে পালক হলদে পাখা
মনজুড়ানো তোমার ডাকা
আয় না তোতা, আয় না,
কালকে দেবো মোম জোছনার আয়না।"

দেখতে না দেখতে বুড়োর কাঁধে এসে বসল নীল তোতা। বলে, "শুনেই এলাম সব উড়তে উড়তে।"

"পালকপাতা পালকপাতা
ভয় করো না কোনো।
স্ফটিক ফুলের শক্তি আছে,
লাগবে কাজে জেনো,
স্বচ্ছ ও ফুল জটাবুড়ির
চোখের সামনে নেড়ো
মিথ্যার ডাল ঘুচবে বুড়ির
হবেই হবে হেরো।"

মাছ বলে, "হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। ফুলের স্বচ্ছতা সব অশুভ কাটাতে পারে।"

পালকপাতা একা এগিয়ে চলে। গলোযোগ হলে বুড়ি সাবধান হয়ে যেতে পারে। হাতের ফুলও যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে পালকপাতার ছোঁওয়ায়। নদীর জল ছাড়াই দিব্যি চনমনে।

কুঁড়ে ঘরে মাটির সরায় একমনে লাউডগা আর চিংড়ি চচ্চড়ি খাচ্ছিল বুড়ি পান্তাভাতে মেখে, দোরে পেছন করে। জমিদারপুত্রকে জব্দ করে মনে বড় শান্তি তার। খুব বিদ্যার জোর দেখায় জমিদার। আর শক্তিরও। বলে কিনা এ জঙ্গলে থেকে ক্ষতি করা চলবে না কারোর জড়িবুটি দিয়ে। লাউডগা নয়, যেন জমিদারের মাথা চিবুচ্ছে বুড়ি।

চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় পালকপাতা। কথায় বলে, ঢিল মারলে পাটকেল খেতেই হবে। শব্দ না করে বুড়ির পেছন থেকে চোখের সামনে ঝুলিয়ে ধরে স্ফটিক ফুলের গোছা। বুড়ি কোনো প্রতিরোধের সুযোগ পায়না। স্ফটিক ফুল বুড়ির মনে সাদা করে দেয়।

জটাবুড়ি বল, "ভুল করেছি কন্যে। এত কাল অনেক ভুল করেছি। শুধু নিজের আনন্দের জন্য নিরপরাধদের ক্ষতি করে।"

পালকপাতা বলে, "দাও তবে বলে সুকমলকে উদ্ধারের উপায়।"

"শেওড়া ডোবায় নামা কারোর সাধ্য নয়। হিংস্র পিরহানে ছেয়ে আছে জল। কিন্তু যদি কোন মতে পৌঁছানো যায় কুমারের কাছে, তবে এই স্ফটিকফুলের রসেই আছে ওষুধ। তারপরের কথা আমি মনে করতে পারছি না। সাদা হয়ে গেছে মন আমার। মন্ত্রতন্ত্র খেয়ালে আসেছে না কিছু।"

এতক্ষণে এসে পৌঁছেছে সকলে। বুড়ির কথা শুনেই নীলতোতা এক কাপাসতুলোর সাথে চলল উড়ে ডোবার ওপর দিয়ে। তোতার পিঠে পুঁচকে মাছ। মাছের পেটে বুড়ির হাতে বানানো ফুলের রস।

ভোরবেলাই একে একে চুপ করে কুমিরের দৃষ্টি এড়িয়ে ওরা সাবধানে নামল সুকমলের বুকের ওপর। জড়বুদ্ধি সুকমলের দুই চোখে মুখে ছোট্ট মাছ ফোঁটায় ফোঁটায় ঢেলে দিল স্ফটিক ফুলের রস। পরে কাপাস তার কানে কানে বলল, "কুমার, খুব সাবধানে নিঃশব্দে উঠে বসুন। আপনি বন্দি শেওড়া ডোবার মাঝখানে।"

বুদ্ধিমান সুকমল চট করে বুঝে নিল পুরো অবস্থাটা। সেই ভয়ংকর কুমিরের পিঠে সাবধানে ফিসফিসানি পরামর্শ চলল ওদের। কুমিরের তখন বিশ্রামের সময়। সে ঘুমিয়ে আছে ভেসে ভেসে।

সুকমল জানতো এক মুহূর্ত বিনা উপকরণের জোগান পেলে নিমেষেই নানা দরকারি জিনিস বানিয়ে দিতে পারতো।

বলল, "কাপাস তোমার ভাই বোনদের আসতে খবর দাও। এক্ষুণি।"

অল্প সময়ের মধ্যেই হাজারো হাজারো কাপাস এসে ভেসে বেড়াতে লাগল। আর অতি সন্তর্পণে তাদের দিয়ে সুকমল বানিয়ে ফেলল দুটি তুলোর পাখা।

তোতা বার বার করে খেয়াল রাখছিল কুমিরের চোখ দুটো। সূয্যি ডোবে ডোবে। এখনই ঘুম ভাঙবার কথা কুমিরটার।

ধুকুপুকু প্রাণ নিয়ে উড়ান লাগাল সুকমল। পেছনে পেছনে তার সঙ্গী নীল তোতা, আর পিঠে মাছ।

ডাঙার অল্প দূরে ছায়া বনে অপেক্ষা করছে পালকপাতার গোটা গ্রাম। সঙ্গে উদাস বুড়ো।

ওরা সেই ছায়াবনে নামতেই সকলে হই হই করে আনন্দে পাগল প্রায়। পালকপাতার বাবা মা বলল, "গ্রামে ফিরে চলো সবাই। শুভ কাজটা শেষ হওয়া চাই।"

উদাসবুড়ো এগিয়ে এসে হাতদুটো ধরে সুকমলের। "ভাল রেখো আমার নাতনিটাকে। উপহার কিছু আনতে পারিনি তোমায় দেবার মত।"

সুকমল বলে, "দাদু, আজ আপনি না এলে আমার প্রাণ বাঁচতো কিনা সন্দেহ। এই তো আমার উপহার। আর ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে। তোতা, মাছ আর কাপাসের দল।"

তারপর ? তারপর নরম চাঁদের আলো মেখে, প্রজাপতি আর মৌমাছির গান শুনতে শুনতে, মধুভরা মিঠাই, সুস্বাদু খাবার দাবারে সারারাত চলল সুকমল আর পালকপাতার বিয়ের অনুষ্ঠান। সে যা দেখবার মত হয়েছিল তা তোমাদের টুনির আলো জ্বলা, ফোয়ারা বসানো বিয়েবাড়িতে পাতপেড়ে খেয়ো তোমরা কল্পনাই করতে পারবে না।

রাজা বিক্রমনারায়ণ রায়। নামের সাথে সব মানুষেরই চরিত্রের কিছু কিছু মিল থাকে। যেমন যার নাম শান্ত, সে শান্ত প্রকৃতির। যার নাম দুরন্ত সে হয় দুরন্ত প্রকৃতির।

সে যাক, যা বলছিলাম। বিক্রমনারায়ণ রায় একটুতেই তাঁর বিক্রম প্রকাশ করতেন। পান থেকে চুন খসলেই লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিতে তিনি দু'বার চিন্তা করতেন না।

তার ঘোড়াশালে বেশ কয়েকটি সুন্দর সুন্দর চেহারার ঘোড়া ছিল। তার মধ্যে একটি ঘোড়াকেই তিনি বেশি ভালবাসতেন। পছন্ত করতেন। তার নাম ছিল সিরাজ।

একদিন সকালে রাজা বিক্রমনারায়ণ রায় রাগে অগ্নিশর্মা। গর্জন, চিৎকার, চেঁচামেচিতে রাজবাড়ি তটস্থ, ভীত, সন্ত্রস্ত। এই বুঝি কোন অনর্থ ঘটল। চেঁচামেচির মাঝে বোঝা গেল সিরাজকে পাওয়া যাচ্ছে না।

রোজ সকালে সকলে ঘুম থেকে ওঠার আগে নিয়মমতো আস্তাবলে যান, আদরের সিরাজকে আদর করেন, নিজে খেতে দেন, তারপর অন্য কাজে মন দেন বিক্রমনারায়ণ রায়।

আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজা নিয়মমতো ঘুম থেকে উঠে আস্তাবলে গিয়ে দেখেন সিরাজ নেই। এদিক ওদিক কোথাও না দেখতে পেয়ে চিৎকার গর্জন।

ঘোড়সওয়ার, পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজ সকলকে ডেকে নির্দেশ দিলেন যে যেখান থেকে পারো খুঁজে দুপুরের মধ্যে সিরাজকে হাজির কর। না হলে সকলকেই গারদে আটক করব।

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেউই সিরাজকে খুঁজে রাজার কাছে হাজির করতে পারল না। রাজাও তার কথা মতো ঘোড়সওয়ার, পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ সকলকে ধরে গারদে আটক করলেন।

তিন দিন তিন রাত অতিক্রান্ত, সিরাজের সন্ধান না পেয়ে শোকে রাজা নাওয়া খাওয়া ছেড়ে শয্যাশায়ী।

এই কথাটা কেমন করে যেন সেই রাজ্যের এক অজ গ্রামের আধপাগলার এক লোকের কানে গেল। সে সাহসে ভর করে রাজার কাছে সিরাজকে খুঁজে দেবার অনুমতি চাইল।

রাজা বিক্রমনারায়ণ রায় প্রথমে আধপাগলা লোকটাকে দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে দূর দূর করে লোকটাকে তাড়িয়ে দিতে গেলেন। শেষে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে রাজা হাজি হলেন এবং আধপাগল লোকটাকে অনুমতি দিলেন সিরাজকে খোঁজ করে ধরে আনবার জন্য।

আধপাগলার গল্প

সমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

আধপাগল লোকটা সকালে খুঁজতে বেড়িয়ে দুপুরের মধ্যেই সিরাজের পিঠে চেপে রাজার সামনে হাজির। রাজবাড়ির সকলে তো হতভম্ভ। রাজার সৈন্য সামন্তরা তিন দিন তিনরাত ধরে খুঁজেও যে কাজ করতে পারল না, সেই কাজ এই আধ পাগল লোকটা এক বেলাতেই করে ফেলল।

রাজা মশাই তো সিরাজকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। নিজের গলা থেকে মণিমাণিক্য বসানো হারখানি আধপাগলা লোকটার গলায় পরিয়ে দিলেন এবং রাজদরবারে তাকে কাজে নিযুক্ত করলেন।

হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই পাগলা, তুই কি করে এর খোঁজ পেলি বলতো ? তুই সিরাজকে লুকিয়ে রেখেছিলি না তো ?"

আধপাগলা লোকটা বলে, "না মন্ত্রীমশাই, আমি লুকিয়ে রাখিনি। আর কী করে আমি সিরাজকে খুঁজে পেলাম, তাই বলছি শুনুন —"

"আমি প্রথমে ঠিক করলাম, যদি আমি ঘোড়া হতাম তাহলে ঠিক কোথায় কোথায় যেতে পারতাম। তো সেই জায়গাগুলো খুঁজতে লাগলাম। প্রথমে গেলাম রাজ্যে যত আস্তাবল আছে সেখানে। সেখানে না পেয়ে গেলাম ঘোড়দৌড়ের মাঠে। সেখানে না পেয়ে গেলাম ভালুকানদীর ধারে, ছোলার ক্ষেতে। গিয়ে দেখি সিরাজ মনের সুখে ছোলা খাচ্ছে। তারপর আরকি, ধরে নিয়ে চলে এলাম ছোটাতে ছোটাতে।"

রাজামশাই সব শুনে ভারী সন্তুষ্ট হলেন, আহ্লাদিত হয়ে বললেন, "শোন, তুমি আমার কাছে যা চাইবে তাই আমি তোমায় দেব। কতা দিচ্ছি, কী চাও বলো।"

আধপাগলা লোকটা বলল, "রাজামশাই আপনি গারদে আটক ঐ লোকগুলো ছেড়ে দিলে আমি খুব আনন্দ পাব।"

রাজা সকলকে গারদমুক্ত করলেন, সকলে আধপাগলটার উদ্দেশ্যে ধন্য ধন্য করে উঠল।

সঞ্চিতা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

অমিয়কুমার সেনগুপ্তের

ছোটদের জন্য ছ'টি মনমাতানো ছড়াগ্রন্থ

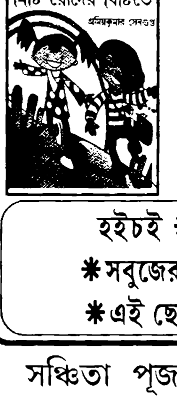

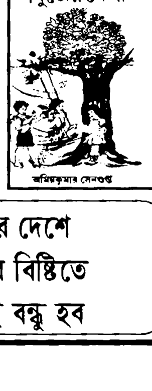

হইচই ✱নীল আকাশে মেঘের দেশে
✱সবুজের মেলা✱ মিষ্টি রোদের বিষ্টিতে
✱এই ছেলেটি ✱আমরা সবাই বন্ধু হব

কথাকৃতি

প্রকাশনী
বেথুয়াডহরি/নদিয়া
নীলাদ্রিশেখর সরকার
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য
প্রকাশনা

কথকৃতি প্রকাশনী
বেথুয়াডহরি. নদিয়া
নীলাদ্রিশেখর সরকার
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

শরতের শিউলি

চুনী দাশ

এক বাগানে একটা শিউলি ফুলের গাছ। বড়ই জীর্নশীর্ন। শুষ্ক। ধূসর পাতা আর ডালপালা নিয়ে গাছটা যেন সারা দিনরাত ঝিমোচ্ছে।

তেমনি দিনে, একদিন ভোরের হাওয়া এসে ওর কানে কানে বলল, ওহে শিউলিগাছ! জড়ের মতন এভাবে আর কতদিন কাটাবে ? একটু নড়োচড়ো না। গা ঝাড়া দিয়ে চোখ মেলে তাকাও না । শরতের তো আসার সময় হয়ে গেল বলে।

তোমার ডালপালাগুলো ঝেড়েঝুড়ে ধুয়েমুছে সাফসুতরো করবে না ? পাতাদের সবুজের বাহারে সাজাবে না ? ফুলকুঁড়িদের সাজিয়ে গুজিয়ে নাচগানের আসরে যাবার জন্যে প্রস্তুত করবে না ? আর বেশি দেরি করলে কিন্তু শেষে পস্তাতে হবে। এই বলে ভোরের হাওয়া চলে গেল।

ভোরের হাওয়ার কাছে শরতের আগমনবার্তা পেয়ে শিউলিগাছে যেন প্রাণের সঞ্চার হল। তখন তখনই শিউলিগাছ নিজেকে পরিপাটি করে সাজাতে লেগে গেল। তারপর একটু একটু করে ধীরে ধীরে ওর জরাজীর্ন জালপালাগুলো সবুজ সতেজ সুন্দর করে গড়ে তুলতে লাগল। ওর সারা অঙ্গ সবুজের আস্তরণে ঢেকে দিতে লাগল।

তাই, কিছুদিনের মধ্যেই ওর ডগায় ডগায় শিউলির কুঁড়িরা চোখ মেলে মেলে ফুটি ফুটি করে সারি বেঁধে উঁকি দিতে লাগল। আর মিঠিমিঠি হাসির ফোয়ারায় চারদিক ভরে দিতে লাগল। ওদের রূপলাবণ্যে আর মনমাতানো সৌরভের প্লাবনে চারধার ম ম করে উঠতে লাগল !

তারপর একদিন ফুলকলিরা পাপড়ি ছড়িয়ে ছড়িয়ে ভোরের হাওয়ায় ঝরে ঝরে ঘাসে ঘাসে পড়তে শুরু করল।

শরতকালও শিউলিফুলের নাচে গানে শোভায় সৌরভে বিভোর হয়ে মেতে উঠল।

দেখতে দেখতে সময় ফুরিয়ে যেতে লাগল। একদিন শরতেরও যাবার সময় এগিয়ে আসতে লাগল। পা-টিপে পা-টিপে। শরৎ তলে তলে যাবার জন্যে তৈরিও হতে শুরু করে দিল।

এদিকে শিউলি গাছের মাতৃজঠরে যে সব কুঁড়ি, ফুলকলি ছিল, ওরা সবাই একে একে বেরিয়ে এসে শরতের আলিঙ্গনে হেসে খেলে নেচে গেয়ে হৈ হুল্লোড় করে সৌরভ সৌন্দর্য ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎশরতকে যাবার জন্যে তোড়জোড় করতে দেখেই সবাই একজোট হয়ে অভিমানী সুরে বলে উঠল, শরৎ, তুমি আমাদের মোটেই ভালোবাসো না। তাই তো আসতে না আসতেই আবার চুপিসারে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাবার জন্যে

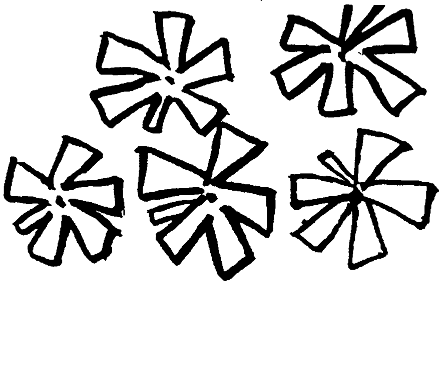

গল্পের পরবর্তী অংশ ৭৮ পৃষ্টায়...

হাটের একপাশে ভিড় দেখে ভিকু এগিয়ে গেল ; ভিড় ঠেলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখল, জমকালো পোশাক ও মাথায় টুপি পরে এক জাদুকর খেলা দেখাচ্ছে। ভিকু যাচ্ছিল বাবার দুপুরের খাবার পৌঁছে দিতে ; বাদার জমিতে ধান কাটার সাড়া পড়েছে। ওর বাবা সেখানে মুনিষ খাটছে। ভিকু রোজ দুপুরবেলা বাবাকে খাবার পৌঁছে দেয়, তারপর খাওয়া হলে এঁটো বাসনগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আজ রইল ভিকুর খাবার পৌঁছে দেওয়া। হা করে জাদুকরের জাদু দেখতে লাগল সে। তাসের ম্যাজিক, টুপির ভেতর থেকে পায়রা বের করা, গ্লাসের দুধ হাওয়ায় মিলিয়ে দেওয়া, দশটাকার নোট ভ্যানিশ করা কত কী ! দর্শকেরা খেলা দেখে আনন্দে জাদুকরকে পয়সা দিয়ে যে যার গন্তব্যে চলে গেল, কিন্তু ভিকুর নড়ার কোন লক্ষণ নেই।

"কীরে ছোকরা ! বাড়ি যাবিনা ? খেল্ তো খতম্ !" জাদুকর বলল

"ও তাই তো ! বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করে না খেয়ে থাকবে !" ভিকুর মনে পড়ল।

"কোথায় থাকিস তুই !"

"ওই তো, পাশের গ্রামে" হাত দিয়ে দেখাল ভিকু।

"তোর নাম কী ?"

"ভিখারি প্রসাদ, সবাই আমাকে ভিকু বলে ডাকে

"কোন ক্লাসে পড়িস ?"

"ক্লাস সেভেনে। তোমার এই ম্যাজিকগুলো আমাকে শিখিয়ে দেবে ?" অনুনয় করল ভিকু।

"হাঃ হাঃ হাঃ ! ম্যাজিক শেখা বড় কঠিন কাজ সবার দ্বারা এ কাজ হবে না

"হোক কঠিন, আমি ঠিক শিখে নেব। তারপর বন্ধুদের দেখাব"

"ঠিক আছে, আজ সন্ধেবেলা আমার তাঁবুতে আয় তোকে শিখিয়ে দেব

"সত্যি ! কী মজা। তোমার মত ছড়ি ঘুরিয়ে তাসকে পায়রা বানাতে পারব

"নিশ্চয়ই, শুধু পায়রা কেন, মানুষকে ব্যাঙ বানাতেও পারবি কিন্তু একটা কথা, ম্যাজিক শেখানোর কথা কাউকে বলা যাবে না। জাদুকরের চোখের তারায় খেলা করছে শয়তানি

দুষ্টু জাদুকর

দেবদুলাল কুণ্ডু

হাসি।"

খুশিমনে ভিকু বাবার খাবার নিয়ে এলো বাদাতে। ওকে দেখে বাবা তখন রীতিমত রাগে ফুঁসছে। "এত দেরি করলি যে বড় ! নিজের তো চারবেলা খাওয়া ঠিক আছে, বাপের উপর কোনই মায়াদয়া নেই।"

"বাবা, এই কান মলছি, নাক মলছি, আর হবে না। এবারের মত ক্ষমা করে দাও।"

ভিকু তাদের একমাত্র সন্তান, তাই ওর উপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না ওর বাবা মা। খাওয়া শেষ হলে বাবা ওর মাথা নেড়ে আদর করে দিয়ে বলল, "তুই খেয়েছিস ?"

"হ্যাঁ, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসো কিন্তু।" বাড়ির পথে পা বাড়াল ভিকু।

(২)

সন্ধের ঠিক আগে "মা টিউশন পড়তে যাচ্ছি" বলে বই হাতে বাইরে বেরল ভিকু।

"পড়া আছে আগে বলিসনি তো !" অবাক হয়ে মা জিজ্ঞেস করল।

"ভুলে গেছি বলতে।"

ভিকু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে এল হাটের কাছে। আস্তে আস্তে হাটুরেদের আনাগোনা থেমে যাচ্ছে। দুটো একটা ক্লান্ত লন্ঠন এদিক ওদিক জ্বলছে। মালপত্র গুটিয়ে সবাই যে যার বাড়ি রওনা দিচ্ছে। ভিকু চলে এল জাদুকরের তাঁবুর কাছে। ওর পায়ের শব্দ পেয়ে তাঁবুর ভেতর থেকে প্রশ্ন ভেসে এলো, "কে- ?"

"আমি ভিকু, সকালে বললেন আসতে...।"

"ভেতরে আয়।" পিরামিড আকৃতির তাঁবুর পর্দা ঠেলে ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকলো ভিকু

লন্ঠনের মৃদু আলোতে ভিকু দেখল, তাঁবুর চারপাশে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে ম্যাজিক প্রদর্শনীর নানা সরঞ্জাম – নানা আকৃতির বল, কাঁচের গ্লোব, গ্লাস, ড্রাম, টুপি কত কী ! তাঁবুর পেছনের দিকে একটা চেয়ার-টেবিলে বসে আছে জাদুকর টেবিলের উপর নামানো আছে তার সরু ছড়িটা জাদুকর ডাইরি খুলে আপন মনে খস খস করে কী যেন লিখে চলেছে

"এখানে বস " সামনে পেতে রাখা টুলটা দেখিয়ে দিয়ে বলল জাদুকর ভিকু টুলে বসল।

"এটা কী বলত ?" ছড়িটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল জাদুকর।

"এটা জাদুছড়ি

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস. এটা জাদুকরের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস। জাদুকরের তিনটে হাত থাকে। এটা সেই তৃতীয় হাত। সব কারসাজি এই ছড়ির ভেতরে। যেকোন গাছের ডালকেই জাদুছড়ি বানানো যায় না। আবার ডাল ছাড়া অন্য জিনিস দিয়েও এই ছড়ি হতে পারে, যেমন ধর গরুর পায়ের হাড়, তিমির ব্যাকবোন, অথবা মানুষের..." শেষের দিকে জাদুকরের কন্ঠ ভারি হয়ে উঠল।

"এটা কী দিয়ে তৈরি ?" কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে ভিকু।

"এটা কাঠ দিয়ে তৈরি। বাজ পড়ে মৃত সেগুন গাছের ডালকে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা। আস্তে আস্তে সব জেনে যাবি। এই ছড়িটা আমাকে দিয়েছিলেন আমার গুরুজি। তোর কাজে নিষ্ঠা থাকলে আমিও তোকে এরকম একটা ছড়ি দেব।"

একটু থেমে জাদুকর টেবিলের উপর রাখা কাচের গ্লাস থেকে জল খেল, তারপর আবার বলতে শুরু করল, "ম্যাজিক দেখাতে হলে সবার আগে শিখতে হবে হাত সাফাইয়ের পদ্ধতি।এর জন্য দরকার প্রখর বুদ্ধি এবং তৎপরতা। সামনে বসে থাকা হাজার হাজার জনতার চোখে ফাঁকি দিতে হবে – ধাঁধাঁ লাগাতে হবে, মুখে মন্ত্র আওড়ে হাতে ছড়িটা ঘোরাতে হবে। ব্যস ওইটুকুতেই ট্রাপে পড়ে যাবে সবাই। এরই নাম ইন্দ্রজাল। তবে আরো একটা বিদ্যা শিখতে হবে এই পেশায়।"

"সেটা আবার কী ?"

"সম্মোহন বিদ্যা। মানুষকে বশ করার বিদ্যার নাম সম্মোহবন। স্থির মায়াবি দৃষ্টিতে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে বিবশ করতে পারলেই মিলবে জাদুকর স্বীকৃতি।"

"এতসব শিখতে কত দিন সময় লাগবে ?"

"শেখার উপরে নির্ভর করছে, তবে ধরে রাখ পাঁচবছর। তোর কি অত ধৈর্য আছে ?"

"নিশ্চয়ই পারব।"

"কিন্তু আমি তো চিরকাল তোদের এই গ্রামে তাঁবু গেড়ে বসে থাকব না... আবার অন্য গ্রামে যেতে হবে.. এটাই আমার পেশা।"

"আমিও যাব তোমার সঙ্গে।"

"তোর বাবা-মা তোকে ছাড়বে না। তুই বাড়ি ফিরে যা।"

"না না আমি আর ফিরবো না।"

"ওরা যদি জানতে পারে তুই আমার তাঁবুতে আছিস, তবে ছেলে চুরির অপরাধে আমাকে থানায় পুরে দেবে।"

"সে আমি জানিনা, আমি আর বাড়ি ফিরব না বলে রাখলাম।"

"শোন শোন, তুই এক কাজ কর, আজ বরং বাড়ি ফিরে যা। রাতে ভালো করে ভেবেচিন্তে ঠিক কর কী করবি। কারণ আমাদের জীবন যাযাবরের জীবন। তারপর কাল সন্ধের সময় আয়। আমিও এদিকে সব কিছু গুছিয়ে রাখি..একটা কথা... বাড়িতে জানলে কেউ কিন্তু পারমিশন দেবেনা। হাঃ হাঃ হাঃ.." শেষের দিকে জাদুকরের গলা রহস্যময় হয়ে ওঠে।

(৩)

সেই রাতে ভিকু মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল। ঘুমের ভেতরে ভিকু একটা স্বপ্ন দেখল - একটা মস্তবড় ব্যাঙ ওকে তাড়া করেছে, ব্যাঙের হাতে একটা জাদুছড়ি। ছুটতে ছুটতে ও

চলে এলো নদীর পাড়ে, আর পালাবার পথ নেই। ব্যাঙটাও লাফাতে লাফাতে ওর প্রায় কাছে চলে এসেছে। ও কিছু চিন্তা না করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে দেখল, ও ওদের বিছানাতেই শুয়ে আছে। মনে পড়ল আজই তো ওকে জাদুকরের সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে চলে যাবার কথা। মা-বাবার জন্য কষ্টও হতে লাগল মনে। কিন্তু জাদুবিদ্যা শেখাটার মজাও কম নয়। মাত্র পাঁচটা বছর, দেখতে দেখতে পার হয়ে যাবে। ভিকু একটা চিঠি লিখতে বসল, "মা ও বাবা, আমি নতুন একটা বিদ্যা শেখার জন্য পাঁচ বছরের জন্য বাইরে যাচ্ছি। আমার জন্য দুঃখ কোরনা। আমি ভালই থাকব। ফেরার সময় এত এত টাকা নিয়ে ফিরব, তোমাদের আর কষ্ট থাকবে না। ইতি তোমাদের ভিকু।"

চিঠিটা নিজের বইয়ের ব্যাগের উপরের পকেটে রাখল ভিকু, যেখানে কলম-পেনসিল রাখে সে। তারপর সারাদিনের রুটিন মত কাজ সেরে জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে রওনা দিল জাদুকরের তাঁবুর উদ্দেশ্যে।

জাদুকরের একটা পুরনো জিপগাড়ি আছে, সে তাঁবুর সমস্ত জিনিস গাড়িতে বোঝাই করেছে। শুধু তাঁবুটা এখনো টাঙানো।

"আয় আমার শিষ্য, আয়।" ওকে স্বাগত জানাল জাদুকর। "আমি জানতাম তুই আসবি।"

"আর যদি না আসতাম..."

"না এলে কিছুই করার ছিল না। কিন্তু আজ রাতেই এখান থেকে চলে যাব বলে ঠিক করেছি। আচ্ছা প্রয়োজনীয় একটা কাজ সেরে নিতে হবে তার আগে। টুলে এসে বস।"

জাদুকরের পেতে রাখা টুলে বসল ভিকু।

জাদুকর আবার বলতে শুরু করল, "আমি অনেকদিন ধরে সাধনার বলে একটা শক্তি আয়ত্ত করেছি। মানুষ ছাড়া সকলের উপর সেই শক্তি প্রয়োগ করে দেখেছি আমি। অনেকদিনের ইচ্ছে মানুষের উপর প্রয়োগ করব। আজ তোকে দেখে সেই অপূর্ণ ইচ্ছেটা জেগে উঠেছে।" মায়াজাল বিস্তার করল জাদুকর।

"কী সেটা ?"

"তোকে তো আগেই বলেছিলাম, ইচ্ছে করলেই আমি এক প্রাণীকে অন্য প্রাণীতে পরিণত করতে পারি, যেমন সাপকে ব্যাঙ, ব্যাঙকে সাপে, খরগোশকে বানর, বানরকে খরগোশে, একমাত্র মানুষ ছাড়া... ম্যাজিক শেখানোর আগে একবার তোর উপর সেটা প্রয়োগ করতে চাই।"

"আমি আবার মানুষ হতে পারব ?" আর্তনাত করে উঠল ভিকু।

"নিশ্চয়। গতদিন এই ছড়ির কথা বলেছিলাম। এই ছড়িই আবার তোকে মানুষে পরিণত করবে।" জাদুকর ছড়ি তুলল, মুখ দিয়ে অবৃত্তি করল বিভৎস মন্ত্র, ভিকুর চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হাতের মুদ্রা রচনা করে সম্মোহন করল। ধীরে ধীরে ভিকু তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

(৪)

"আসুন.. আসুন.. এক অভিনব খেলা দেখুন.. এর আগে কোনদিন দেখেননি.. সোনা ব্যাঙে বাঁশি বাজাবে.. অঙ্ক কষবে.. আগুনের ভেতর দিয়ে লাফাবে... আসুন আসুন।" নদীর পাড়ে তাঁবু গেড়ে মুখে চোঙ নিয়ে সমানে ফুঁকে চলেছে জাদুকর। চারপাশের গ্রামগুলো থেকে পিল পিল মানুষ জমতে লাগল জাদুকরের তাঁবুর সামনে। কিছুক্ষণ পরে আরম্ভ হল ম্যাজিক শো। টুপির খেলা, ছড়ির খেলা দেখানোর পরে শুরু হল ব্যাঙের খেলা। একটা বড় মাপের কাচের জারের ভেতর থেকে বের করা হল হলুদ রঙের বড় একটা সোনা ব্যাঙকে।

ব্যাঙটা মুখে একটা সরু ছড়ি আকড়ে ধরে টাঙিয়ে রাখা দড়ির উপর দিয়ে পার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাততালি দিয়ে উঠল। জাদুকর এরপর একটা ছোট্ট বাঁশি তুলে দিল ব্যাঙের মুখের কাছে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ব্যাঙটা বাঁশিতে সুর তুলল। জাদুকর একটা বোর্ডে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ অঙ্ক দিল। আশ্চর্য, ব্যাঙটা কয়েক মুহূর্তে অঙ্কগুলো সঠিকভাবে কষে ফেলল। সবশেষে জাদুকর টেবিলের উপর একটা লোহার রিংয়ের সঙ্গে কাপড় জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর ব্যাঙটাকে নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একলাফে জ্বলন্ত রিংয়ের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে পার হল। উপস্থিত দর্শকেরা আনন্দে আবার হাততালি দিয়ে উঠল।

"সুধী দর্শকমণ্ডলী, সুন্দরবনের বন অঞ্চলে এক অজগরের মুখ থেকে এই ব্যাঙটাকে আমি উদ্ধার করেছি। এর নাম ভিকু। এর খেলা যদি আপনাদের পছন্দ হয়, তবে গ্রামে গিয়ে সবাইকে বলুন। আজকের মত খেলা এখানেই শেষ।" বিনম্র ভঙ্গিতে প্রণাম জানিয়ে জাদুকর তাঁবুর পর্দা বন্ধ করল। তারপর ব্যাঙের দিকে তীর্যক হাসি হেনে টাকা গুনতে লাগল।

"কেমন মিথ্যেকথাগুলো বলে গেল জাদুকর, আমাকে নাকি সুন্দরবন থেকে উদ্ধার করেছে ! হা ঈশ্বর! এই রাক্ষসের হাত থেকে আমি কেমন করে রক্ষা পাব ? ওদিকে বাবা-মা হয়ত আমাকে খুঁজে না পেয়ে মরেই গেল।" চোখে জল এসে গেল ভিকুর। সেদিন রাতে জাদুকর ওকে সম্মোহিত করার পর টেবিলের উপর নেতিয়ে পড়েছিল ভিকু। তারপর জাদুকর মন্ত্রের সাহায্যে ওকে ব্যাঙে পরিণত করে একটা কাচের জারের ভেতরে পুরল। এতদিনে সাফল্যের হাসি ফুটে উঠল জাদুকরের চোখেমুখে। সেই রাতেই গ্রাম ছেড়ে দশক্রোশ দূরে এই গ্রামে নদীর ধারে তাঁবু ফেলেছে সে। জ্ঞান ফিরে পাবার পর ভিকু সব দেখল শুনল বুঝল। কিন্তু ওর করার কিছুই নেই। আগের মত ও কথা বলতে পারে না। তাই কাউকে জানাতে পারেনা নিজের যন্ত্রণার কথা।

টাকাগোনা শেষ করে জাদুকর রুটিতে মাখন আর

চিনি মিশিয়ে আরাম করে খেতে লাগল। তারপর কী খেয়াল হল উঠে গিয়ে আরেকটা কাচের জার থেকে গোটা কয়েক কেঁচো বের করে ফেলে দিল ব্যাঙরূপী ভিকুর জারের ভেতরে।

"ভিকু, খেয়ে নাও বাবা, খুব পরিশ্রম করেছ, খেয়ে নাও। দুর্বল হয়ে পড়লে খাটবে কী করে, হা ঃ হাঃ হাঃ" জাদুকরের মুখে সেই শয়তানী হাসি।

শয়তান জাদুকর এখন ওকে কেঁচো, ঝিঁঝিঁপোকা, আরশোলা এইসব খেতে দেয়। খুব ঘেন্না লাগে ভিকুর। কিন্তু কিই বা করার আছে ওর। খিদেতে পেট জ্বলে যায়। মাঝে মাঝে খেলা দেখাবে না বলে বেঁকে বসে। তখন জাদুকর ছড়ি দিয়ে ইলেকট্রিক শক দেয়। কাচের জারের উপরের একটুখানি ফাঁক দিয়ে আলো হাওয়া ঢোকে ভেতরে। কিন্তু সে আর কতটুকু ? ভিকুর মনে পড়ে যায় বন্ধুদের সঙ্গে আমবাগানে খেলতে যাবার কথা, মনে পড়ে যায় ঘুড়ি ওড়ানোর কথা। বাবা-মায়ের সঙ্গে রাতে খেতে বসা, তারপর এক বিছানায় ঘুমানো... সত্যি বাড়ির বাইরে না বেরোলে বাড়ির প্রতি টান অনুভব করা যায়না।

আর এখন ভিকুকে ব্যাঙ বানিয়ে জারের ভেতরে পুরেছে জাদুকর। রোজ আগুনের রিং-এর ভেতর দিয়ে লাফাতে লাফাতে সারা গায়ে ফোসকা পড়েছে ভিকুর। চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে থাকে ওর। ও ঠিক করল এই কেঁচো কিছুতেই মুখে তুলবে না ও। এই ভাবে মরে যাবে তাও ভাল। চোখ বন্ধ করে চুপটি করে এক যায়গায় বসে রইল ভিকু।

জাদুকর লক্ষ করল ব্যাঙটা নড়ছে না। অন্যদিন জারের দেওয়ালে হাঁচর-পাঁচর করে। আজ একেবারে চুপ মেরে গেল কেন- দেখিতো... মরে গেল নাতো ? এগিয়ে এসে জারটা ধরে জোরে কয়েকবার ঝাঁকালো জাদুকর। কিন্তু ব্যাঙটা অসাড় হয়ে পড়ে রইল দেখে জাদুকর ওকে জারের ভেতর থেকে বের করে টেবিলের উপর রাখল, তারপর পরীক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ একটা কান্ড করে বসল ভিকু, পাশে রাখা জাদুছড়িটা কামড়ে ধরে একলাফে জ্বলন্ত লন্ঠন উলটে ফেলে দিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল সে। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেল জাদুকর, তারপর তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো, ততক্ষণে জাদুছড়িটা মুখে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে ভিকু।

(৫)

বহুক্ষণ নদীতে সাঁতরে স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলল ভিকু। আজ কী বার, এখ ন ক'টা বাজে এসব কিছুই জানে না সে। শুধু দেখল সামনের আকাশটা টকটকে লাল। তার মানে ভোর হয়ে আসছে। ভিকু ডাঙায় উঠল। তারপর থপ থপ করে মাঠঘাট পেরিয়ে লোকালয়ে উঠল। তখন সকাল হয়ে গেছে।

ভিকু দেখল এক বাড়ির বারান্দায় মাদুর পেতে একজন মাস্টারমশাই ছাত্রকে পড়াচ্ছেন। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়, ভিকু মাদুরের পাশে বসল। ওকে দেখে বাচ্চা ছেলেটা বই খাতা ছেড়ে দূরে সরে গেল। ভিকু একটা কান্ড করল, জাদুছড়িটা পাশে নামিয়ে রেখে ছেলেটার কলমটা মুখে নিয়ে খাতার উপর খসখস করে লিখল, "ভয় পেয়ো না, আমি তোমার মতই একটা ছেলে। আমার নাম ভিকু। আমি সেভেনে পড়তাম। একটা দুষ্টু জাদুকর আমাকে ব্যাঙ বানিয়ে দিয়েছে। মাস্টারমশাই আমাকে একটা থানায় নিয়ে চলুন, সেখানে পুলিশের কাছে আমি সব লিখে জানাব। প্লিজ, এই উপকারটুকু করুন আপনি।"

মাস্টারমশাই আর ছাত্র চোখ ছানাবড়া করে দেখছিল ভিকুর কান্ডকারখানা। ভিকু সরে গেলে খাতাখানা তুলে নিয়ে পড়ল ওরা। তারপর সারাগ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল।

ভিকু দারোগাবাবুর সামনে থানার ডাইরিতে লিখল নিজের সবকথা। সমস্ত দেখেশুনে দারোগা হা হয়ে গেলেন। সংবাদ পাঠালেন ভিকুর গ্রামে। দুপুরবেলা পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এলো ভিকুর বাবা-মা। ভিকুর চোখ দিয়ে তখন অনবরত জল ঝরছে।

দারোগাবাবু আরেকটা কাজ করলেন। ভিকুর মথামত নদীর পাড় বরাবর ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে অবশেষে পেলেন দুষ্টু জাদুকরের দেখা। ভিকু বলেছিল, জাদুকর সম্মোহন-বিদ্যায় পারদর্শী। তাই জাদুকরের চোখদুটো বেঁধে জাদুকরকে ধরে নিয়ে এলেন থানায়। মারের চোটে সমস্ত স্বীকার করল জাদুকর। "আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ভিকুর আগের রূপ ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ছড়িটা আমার হাতে দিতে হবে।" কাতর স্বরে বলল জাদুকর।

"সে না হয় দিচ্ছি, কিন্তু চালাকি করলেই খুলি উড়িয়ে দেব। " দারোগাবাবু বললেন।

জাদুকর ছড়ি হাতে নিয়ে ওর দিকে মন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভিকু ফিরে পেল ওর আগের রূপ। মা-বাবা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ভিকুকে।

"ভিকু আর জাদু শিখবে, না ফিরে যাবে বাড়িতে ?" দারোগা জিজ্ঞেস করলেন ওকে।

"না স্যার, আমি বুঝতে পেরেছি বাবা মা-র আদরে-শাসনে বড় হবার মজাটাই আলাদা। আর ম্যাজিক শিখে কাজ নেই। আর একটা কথা ওর জাদুছড়িটা নষ্ট করে ফেলন স্যার। ওই ছড়ির কেরামতিতেই জাদুকর সবার সর্বনাশ করে।"

ভিকুর কথামত দারোগাবাবু নষ্ট করে ফেললেন জাদুকরের জাদুছড়ি। সঙ্গে সঙ্গে জাদুকর আহত বাঘের মত লুটিয়ে পড়ল মাটি তে।

শরতের শিউলি...

এক পা বাড়িয়ে দিয়েছ !

অথচ, তোমার জন্যে আমরা সারাটা বছর ধরে গাছমাতার জঠরে প্রতিদিন তিলে তিলে বেড়ে উঠতে থাকি । আর অধীর আগ্রহে তোমার প্রতীক্ষায় - পথপানে চেয়ে চেয়ে দিন গুনতে থাকি। তুমি এলে – তোমার সঙ্গে হেসে খেলে নেচে গেয়ে সারাক্ষণ আনন্দ-উৎসবে মেতে থাকব বলে। তোমাকে আমরা কিছুতেই যেতে দেব না। সারা বছরই তোমাকে আমাদের এই আনন্দ-উৎসবের সাথি হয়ে থাকতে হবে।

ওদের এই আবদার শুনে শরৎ তখন হেসে-হেসে বলল, আমি তোমাদের ভালোবাসি না, কে বললে ? কে বললে, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি ? তোমাদের ছেড়ে আমি তো কখনো কোথাও যাই না । আমি তো সব সময়ই তোমাদের সঙ্গে আছি – থাকি – থাকবও ! আমি শুধু জায়গা পরিবর্তন করি মাত্র। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এগিয়ে যাই মাত্র ! পৃথিবীর যে অঞ্চলেই ভাবী-শিউলিরা আমার পথ চেয়ে বসে থাকে দিন গুনে, আমি তো সেখানেই সে অঞ্চলেই সেইসব ভাবী শিউলিদের কাছে, মানে তোমাদের কাছেই ছুটে যাই !

এই যে, তোমাদের এখানেও তো আমি একদিন অন্যখান থেকেই ছুটে এসেছিলাম। এই গাছমাতার মাতৃজঠরে আজ আর কেউই আমার আসার প্রতীক্ষায় বসে নেই ! না কুঁড়ি, না ফুলকলি, না ফুটি ফুটি ফুটন্ত ফুল ! কারা আর এখন এখানে আমার সঙ্গে হাসবে-নাচবে- খেলা করবে, গান গাইবে, বলো ?

অন্য অঞ্চলে যারা অর্থাৎ যে শিউলিরা আমাকে আনন্দ-উৎসবের সাথি করে পাবার জন্যে গাছমাতার মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে গাছের ডগায় ডগায় রাতদিন অনবরত উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, আমি তো সেইসব ভাবী ফুলেদের কাছেই- শিউলিদের কাছেই সবার জন্যে পা বাড়িয়েছি ! এ গাছমাতার কুঁড়ি, ফুলকলি, ফুটি ফুটি ফুলরাও অর্থাৎ তোমরাও তো একদিন অমন করেই আমার আসার পথ চেয়ে বসেছিলে - দিন গুনছিলে !

প্রকৃতির অমোঘ বিধান তোমাদেরই তো নিয়ত আমাকে বিয়োগ-ব্যথা দিয়ে দুখের সাগরে ভাসিয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে চলে যেতে হচ্ছে ! তোমাদের বিদায় ব্যথা যে প্রতিনিয়ত আমার হৃদয় বীণায় করুণ সুরে বেজে যাচ্ছে, সেকথা কি তোমরা জানো ?

শরতের এই বুকভাঙা ব্যথাভরা সকরুণ কথা শুনে ফুটন্ত শিউলিরা তখন সব হৃদয়ঙ্গম করতে পারল। তখন ওদের কারও মনেই আর কোন মান অভিমান দুঃখ ক্ষোভ বেদনা রইল না। ঝরে ঝরে যেতে যেতে তাই শিউলিরা প্রত্যেকেই বলে যেতে লাগল, প্রিয় শরৎ, এবার আসি বন্ধু ! তুমি কিন্তু আবার এসো। শুভ বিদায়।

বিনি পয়সায়

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

সকাল বেলায় বললে দাদু, 'ও বুকু ভাই শুনেই যাও
বিনি পয়সায় কী কী মেলে দেখি একটা লিস্টি দাও'
সঙ্গে সঙ্গে লিখেই দিলাম, 'পড়ার সময় মায়ের চড়
বাবার থাপড়, খেলতে গিয়ে সাঁঝ পেরিয়ে ঘর। '
দেখেই দাদু বললে, 'ও ভাই এসব তো খুব সামান্যই
দশের কাছে বলতে গেলে নয়কো তেমন প্রামান্যই
লিস্টি বানাও এমন কিছুর যে সব ছাড়া চলেই না
অথচ রোজ সেসব কথা মানুষ তেমন বলেই না।'
'মনে মনেই খানিক ঘুরে, সমুদ্দুরে সাঁতরিয়ে
চুলকে মাথা ফের লিখলাম আকাশ পাতাল হাতড়িয়ে
বিনি পয়সায় যথেষ্ট পাই তোমার স্নেহ আর আদর
ঠাম্মারও পাই ভালোবাসা যত দেয় আমি হই বাঁদর।'
বললে দাদু, 'না বুকু ভাই, আসল কথা যাও শিখে
সারা জীবন রাখতে মনে খাতার পাতায় নাও লিখে
যে শ্বাস নিয়েই পল অনুপল বয়স বাড়ে জীবনটার
পয়সা ছাড়াই সে প্রাণ দেওয়ার কৃতিত্ব সব ওই হাওয়ার ।
রাত ফুরালেই আসবে সকাল আঁধার যতই নিবিড় হোক'
অমূল্য এই সোনার আলোর কারণটা ওই সূর্যালোক।
দারুণ খরায় যার প্রয়োজন নির্বিকল্প আর অতল
মূল্য ছাড়াই বৃষ্টি দেওয়ার সেই দাবিদার হচ্ছে জল।
বৃক্ষ মানুষ জন্তু পাখি কীটপতঙ্গ রাতদিনের
সব সময়েই পাচ্ছে আশিস রোদ-হাওয়া-জল এই তিনের।

শরৎ বেলা

শেখ গোলাম মাবুদ

তাকিয়ে দেখ আকাশ পানে বলছে যেন কানে কানে
কেমন আছিস ভালো ?
সকালবেলা শিশির ঘাসে মুক্তা যেন ছড়িয়ে হাসে
রবির দেওয়া আলো।
পাখপাখালি শাখির শাখে মধুর শিসে ডাকতে থাকে
আয়না আমার পাশে।
নিজ খেয়ালে চলছে নদী ঢেউয়ের খেলা নিরবধি
বাতাস দুলছে কাশে।
নীল আকাশে মেঘের খেলা ভাসছে যেন সাদা ভেলা
রোদ মেখে করে খেলা,
পূজা আসে মাদল বাজে নতুন পোশাকে সবাই সাজে
কতই খুশি সারাবেলা।

শামশের চাচা, নীল হাফ হাতা জামা, চেক লুঙ্গি। লম্বাটে কালো মুখে গোঁফ কামানো আর লম্বা সাদা দাড়ি। মুখের কোণে সবসময় একটা ধরানো বিড়ি   কাঁধে গামছা। জামসেদপুরের সিদগোড়া বাজারে মাছ বিক্রি করতেন শামসের চাচা। ওর বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদের নওদা থানার পাটকেবাড়িতে। চাচা তাই দাদুকে জামাই বলে ডাকতেন। আমার বাবা ওকে চাচা বলে সম্বোধন করতেন। আমিও তাই ছোট থেকেই ওকে শামসের চাচা বলে ডাকতাম। আমার মাকে বৌমা বলে ডাকতেন চাচা। শৈশবে চাচা মানে যে কাকা এটা আমি বুঝতাম না। পরে মা বুঝিয়ে দিলেও ডাকটা আর বদলাতে পারিনি। মাছ বিক্রি ছাড়াও শীতকাল এলেই মুর্শিদাবাদ থেকে খেজুরগুড় এনে বিক্রি করতেন চাচা। আমার বাবা ঝোলা গুড় খেতে খুব ভালোবাসতেন। আর চাচার আনা খেজুরগুড় ছিল ভীষণ ভালো। দাদু তাই প্রতি শীতেই বাঁধা খদ্দের ছিল শামসের চাচার। মাটির কলসি থেকে লোহার হাতা বের করে যখন গুড় বার করতো চাচা তখন অপূর্ব একটা গন্ধ বার হত। ঐ গন্ধটার জন্যেই হয়তো শামসের চাচাকে অত ভালো লাগতো আমার।

বিকেলে যেদিন কোন কাজ থাকত না আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসত চাচা। আমাদের পাড়ায় এক কাবুলিওয়ালা শাহবাজ খান হিং বিক্রি করতে আসত। তার মেহেদি করা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, বড় জোব্বা এবং ঢাউস ব্যাগ তার সম্পর্কে এক ভয়ের মিথ তৈরি করেছিল শিশুমনে। এই খান সাহেবই খুব বন্ধু ছিল চাচার। চাচা যখন বেড়াতে আসত ঐ খান সাহেবের কাছ থেকে আমার জন্যে কাজু, পেস্তা, আখরোট কিনে নিয়ে আসতআমার জন্য। এভাবেই কখন যে শামসের চাচা আমার শৈশবের বন্ধু হয়ে উঠেছিল নিজে কখনও বুঝতে পারিনি।

ইস্কুলে যেতাম ইষ্টবেঙ্গল কলোনীর মধ্যে দিয়ে। উদ্বাস্তু কলোনী যার পোষাকী নাম ছিল ইষ্টবেঙ্গল কলোনী। সেখানে আসা যাওয়ার পথে মূর্তি তৈরি হতে দেখতাম। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম দেবী দুর্গার মূর্তিতে ধীরে ধীরে কীভাবে রঙের প্রলেপ পড়ে আর মনে দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজ পুজোর দিনের অপেক্ষার দিন গোনে। মূর্তি গড়ার ব্যস্ততায় সেদিনের শিল্পী নিতাই পাল আমাদের দাঁড়াতে বারণ করতেন। অবাধ্য মন মানতো না সেই নির্দেশ। মনে হত, না দাঁড়ালে বুঝি দেখার একটা অনুসঙ্গ বাদ পড়ে যাবে। বাড়ি ফেরার পথে বন্ধু চাচার সাথে রোজ দেখা হত। আমার আগ্রহকে আরো রঙিন করে তুলতে উনি প্রতিদিনই জিজ্ঞেস করতেন, ভাইজান, আর কত দেরি বুঝঝো শেষ হতে। চাচার মুখেই আমি একটি মুসলিম বাচ্চা ছেলের তার বাবার সাথে দুর্গা ঠাকুর দেখার গল্প শুনেছিলাম যার রেশ আজো মনের গহীনে অম্লান। গণেশের শূঁড় দখে বিস্মিত ছেলেটি নাকি তার বাবাকে বলেছিল - হা বাপজান, মা দুগ্গির ছোট ছেইলের হাতির মতো শূঁড়। উয়ার তামুক খাওয়া তো ভারি ব্যাজুত। লয় ? চাচা বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্পটা বলতেন।

আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন অজয় জেঠু। দৃঢ় বলিষ্ঠ ও ঋজু চেহারার অজয় জেঠু ওনার কোয়ার্টারে কালিপুজো করতেন, তাঁর চন্ডীপাঠ শুরু হত মহালয়ার দিন থেকে। সন্ধ্যের আধো অন্ধকারে পরিচ্ছন্ন ও উদাত্ত উচ্চারণের স্তোত্রপাঠ করার সময় প্রতিদিন শামসের চাচা নির্দিষ্ট মনে শুনতেন পাশের পেয়ারা তলায় বসে।

আজো বিজয়া দশমী এলেই দুটো কারণে মনে পড়ে শামসের চাচাকে। দাদুর

শামসের চাচা

ভাস্কর বাগচী

নির্দেশে বাবা প্রতিবছর বিজয়া দশমীর রাতে নেমন্তন্ন করতেন চাচাকে। দিদিমার তৈরি নারকেলের তক্তি সন্দেশ, দাদুর হাতের তিলের নাড়ু, মায়ের বানানো মাংসের ঘুঘনি বেশ তৃপ্তি করে খেতেন চাচা।

এক বিজয়া দশমীতেই ঘটে যায় আর এক মর্মান্তিক বিসর্জন। সেবার পুজোয় বিসর্জনের দিন খুব ঝামেলা হয়েছিল। বিহার পুলিশের অদূরদর্শিতার বলি হয়েছিলেন অনেক নিরীহ মানুষ স্টাম্পেডের কবলে পড়ে। সে সময় আমাদের পাড়ার পুজোর ভাসান চলছিল সুবর্ণরেখা নদীতে। পুলিশি অত্যাচারে যখন ক্ষিপ্ত জনতা ছত্রভঙ্গ তখনই শামসের চাচার নজরে পড়ে আমাদের পাড়ার কিশোরী মেয়ে তানিয়া ডুবে যাচ্ছে চোরাবালিতে। চাচা ঝাঁপ দেন সঙ্গে সঙ্গে। চাচার চেষ্টায় তানিয়া বেঁচে যায় কিন্তু উনি আর উঠতে পারেন নি। বিসর্জনের বাজনায় হারিয়ে যায় চাচার শেষ আর্তনাদ। সেই অকাল বিসর্জনের করুণ রেশ আজো মনের কোঠায় অম্লান শামসের চাচার আত্মবলিদানের স্মৃতিতে। জগৎজননী মা প্রতিবছরই ফিরে আসেন, ফেরেন না শুধু শামসের চাচা।

অলৌকিক ছাতা ঃ তরুণকুমার সরখেল

সঞ্চিতা প্রকাশনী, আমডিহা, দুলমি-নডিহা, পুরুলিয়া-২। মূল্য ৪০ টাকা।

একটি এলেবেলে ছিঁড়ে যাওয়া পুরনো রংচটে যাওয়া ছাতাকে নিয়ে আস্ত একটি কিশোর উপন্যাস এটি। মূলতঃ কিশোর বয়স্ক ও কিশোর মনস্কদের জন্যই এই অলৌকিক ছাতা। ছাতা মাথায় দিলেই ঘটে যায় অলৌকিক কান্ড। এই ছাতা মাথায় দিয়েছেন প্রচেত, অনীশ, মতিরাম, শিমূলবেড়া গ্রামের ধনপতি মুদি, নিতাই, পতিতপাবন, বালকডি গ্রামের অনাদি, শিবতোষরা। কী কান্ড হয়েছে এরপর ? জানতে হলে পড়তে হবে এই উপন্যাসটি।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ প্রণব হোড়।

হারিয়ে যাওয়া
লালমোহন ভট্টাচার্য

কোথায় গেল দিনগুলো সেই বোশখ দুপুরবেলা ?
আম, কাঠালের ঘন ছায়ে চোর-পুলিশের খেলা।
ঝড় উঠতো উড়িয়ে ধুলো পশ্চিমে লাল হয়ে,
হঠাৎ মেঘের পর্দাতলে সূর্য লুকায় খ-এ।
ঘুম হতো না দুপুর বেলা মা ডাকত খোকা,
উড়িয়ে দিতাম ফড়িংগুলো খাইয়ে ছোট্ট পোকা।
আর কি ফিরে পাবো আমি সেই সে দুপুরে বেলা ?
বসে আছি একলা আমি হারিয়ে গেছে খেলা।

সোনার রাজা-রানি
প্রদীপ চৌধুরী

আয় শুনে যা আয়রে তোরা রূপকথার এই গল্পখানি
এক যে ছিল সোনার রাজা আর এক ছিল সোনার রানি।

সেই রাজ্যে নেইকো মানুষ ডাইনিরা সব বাস করে
অন্য দেশের মানুষ ধরে ইচ্ছে মতো আনে ঘরে।

কী ভয়ঙ্কর কী ভয়ঙ্কর যায় না সেথা কেউ,
নদীর বুকে জল থাকেনা তবু আসে ঢেউ।

সেথায় আছে সোনার বাগান আছে সোনার বাড়ি
সেই বাড়িতেই লুকোনো আছে পক্ষীরাজের গাড়ি।

রাজা রানি ইচ্ছেমতো আসতো গাড়ি চড়ে
হঠাৎ একদিন ডাইনিটা যে ঠিক ফেলেছে ধরে।

কী নিষ্ঠুর কী নিষ্ঠুর পক্ষীরাজকে আনি
জাদু-ছড়ি বানিয়ে দিল সোনার রাজা-রানি।

ছোট্ট খুকি
অজয় মাজি

ছোট্ট খুকির মাথায় ঝুঁটি সারাটা দিন ঘুরে,
খেলার ছলে এখান ওখান পালায় অনেক দূরে।
মুখের হাসিতে গোলাপ ফোটে চোখের পলকে নাচে,
হাতের ছোঁয়ায় নোলক বাজে পায়ের নূপুর বাজে।
ছোট্ট খুকির বেজায় রাগ দুষ্টুমিটা হলে শেষ
ছোট্ট খুকির বেজায় হাসি হাসিমুখটি দেখতে বেশ।

চেন্নাই ভ্রমণ

সৌম্যনারায়ণ আচার্য

চেন্নাই বা ম্যাড্রাস হল কলকাতার মত একটা রাজধানী ও প্রাচীন শহর। কলকাতা থেকে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের তীরে করমন্ডল উপকূলে অবস্থিত এই মহানগরে আছে অনেক কিছু দ্রষ্টব্য স্থান, যার জন্য প্রতি বছর অনেক পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। প্রাচীন কালে এর নাম ছিল চেন্নাপ্পাপট্টনম। ১৬৩৯ এর ৮ ই আগষ্ট ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ীরা তদানিন্তন সামন্ত রাজা ভেঙ্কটাদ্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এখানে এক নতুন শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। রাজার অনুরোধে তাঁর বাবা চেন্নাপ্পার নামানুসারে শহরের নাম রাখা হয় চেন্নাপ্পাপট্টনম। এঁরা তিরুপতির কাছে চন্দ্রগিরির আরুভিদু সাম্রাজ্যের রাজাদের অধীনে রাজত্ব করতেন। যদিও এর আগেও যে শহরটি ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন এখানের প্রাচীন মন্দির ও ৫ম শতকের কেল্লা। তবে আগে ম্যাড্রাস কেন বলা হত, সেই ব্যাপারেও অনেক গল্প আছে যেমন, মাড্রে ডে রিউজ নামক এক পর্তুগীজ পর্যটকের নামানুসারে এই নামের সৃষ্টি হয়েছিল। অথবা মদ্রসেন নামক এক ধীবররাজের নাম থেকে, বা মহাভারতে উল্লেখিত মদ্ররাজের নাম থেকে এই নামের সৃষ্টি।

যাই হোক, চলো এবারে এই শহরটি ঘুরে দেখা যাক। চেন্নাই শহরে আছে বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, যার নাম হল মেরিনা সমুদ্র সৈকত। উত্তরে পারিস কর্ণার (বন্দরের কাছে) থেকে দক্ষিণে তিরুভানমিয়ুর পর্যন্ত বিস্তৃত এর দৈর্ঘ্য ১৩.৫ কিমি আর প্রস্থে কোন স্থানে ১৪৩৪ ফুট। প্রায় প্রতিদিন গড়ে ৫০,০০০ পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। সন্ধ্যেবেলায় এখানে বেড়াতে এলে সমুদ্রের জলে ভাসমান জাহাজগুলো দেখতে পাওয়া যায় যার সৌন্দর্য অতুলনীয়। এর কাছে ট্রিপলিকেন অঞ্চলে আছে প্রাচীন পার্থ সারথী কৃষ্ণ মন্দির, এখানে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ রূপে পূজিত হন। তাঁর সাথে পূজিত হন তাঁর তিন স্ত্রী রুক্মিনী, জাম্ববতী আর সত্যভামা, পুত্র প্রদ্যুম্ন আর পৌত্র অনিরুদ্ধ। সপ্তর্ষী এখানে তপস্যা করেছিলেন। পান্ড্য বংশের রাজা থোন্ডাইমানকে এই রূপেই শ্রীকৃষ্ণ দেখা দেন বলে প্রচলিত বিশ্বাস। ৫ম শতকের পল্লব রাজারা বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণ করান। এর কাছেই আছে বিবেকানন্দ হাউস, যেখানে ১৮৯৭ সালে তাঁর চেন্নাই ভ্রমণের সময় স্বামীজী কিছুদিন বসবাস করেছিলেন।

এরপরে আমরা চলে যাব কাপালীশ্বর শিবের মন্দিরে। এই প্রাচীন মন্দিরটি ১৭ শ শতকে আরুভিড়ু সাম্রাজ্যের রাজারা নির্মাণ করান। যদিও স্যান্থম সৈকতে প্রাচীন মন্দিরটি ছিল, কিন্তু ১৬ শ শতকে পর্তুগীজরা সেই মন্দিরটি নষ্ট করে দেয়। তার পরে মায়লাপুর অঞ্চলে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। এর পেছনে যে কাহিনি আছে তা হল, একবার শিব

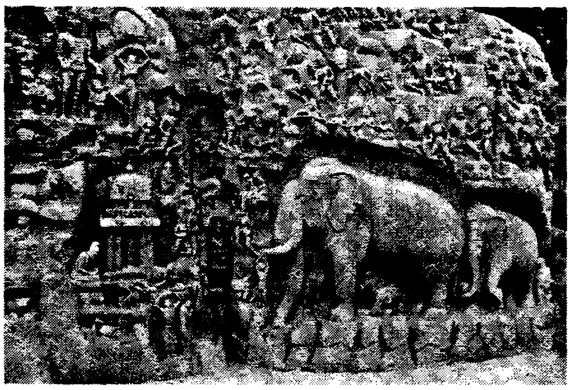

ঠাকুরের দুই চোখ পিছন থেকে হাত দিয়ে মা পার্বতী আড়াল করে দেন। তখন রেগে গিয়ে উনি মাকে ময়ূরী (তামিলে মাইলি) বানিয়ে দেন। তখন তপস্যা করে মা পার্বতী নিজের রূপ ফিরে পান, তাই এই অঞ্চলের নাম মায়লাপুর। এছাড়া চেন্নাইয়ে রয়েছে অনেকগুলি মন্দির, বাঙালিদের কালিবাড়ি আছে। তিরুশুলমে আছে আরো একটি প্রাচীন শিবের মন্দির ও ৪০ কিলোমিটর দূরে তিরুভাল্লুরে আছে অনন্ত শয়নে শায়িত বীররাঘবের (নারায়ণ) মন্দির। এইসব মন্দিরগুলি তাদের সুন্দর সুন্দর কারুকার্য খচিত স্তম্ভ ও চূড়োর জন্য বিখ্যাত। স্যান্থম ও এলিয়ট সমুদ্র সৈকত দুটি হল মেরিনা সমুদ্র সৈকতের শেষ ভাগ। এখানে আছে অষ্টলক্ষ্মীর মন্দির। মাত্র ৫০ বছর আগে নির্মিত এই মন্দিরের আট তলায় আছে আটটি মা লক্ষ্মীর মন্দির। একদম শীর্ষ থেকে সমুদ্রের দৃশ্য এক কথায় দারুণ। স্যান্থম সৈকতে আছে স্যান্থম গির্জা। এই প্রাচীন গির্জায় আছে ২০০০ বছর আগে সন্ত লুক দ্বারা অঙ্কিত মা মেরির এক ছবি। যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য সন্ত টমাস এখানে এসেছিলেন ও উনিই এই ছবিটি এনেছিলেন। সেন্ট টমাস মাউন্টে আছে এই সন্তের সমাধি। পারিস কর্ণার অঞ্চলে আছে কালি আম্বার মন্দির। ১৬৭৭ সালে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজী এখানে এসে পুজো করেছিলেন। মন্দির গাত্রে সেই ছবি দেখতে পাওয়া যাবে।

চেন্নাই মিউজিয়াম বা জাদুঘর হল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে আছে ২০০০ বছরেরও বেশি পুরোনো স্বর্ণ মুদ্রা, বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি, নানান ভাষায় রচিত পুঁথি ও আরো অনেক কিছু। রাজা ভেঙ্কটাদ্রীর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়া স্বর্ণ পত্রটিও (অনুমতি পত্র) এখানে আছে। ১০ম শতকের চোলা সাম্রাজ্যের রাজাদের সময়কার নটরাজ মূর্তিটি নিঃসন্দেহে এক অন্যতম আকর্ষণ। বর্তমানে এই শহরটিতে প্রায় দেড় লক্ষ বাঙালি থাকেন, টি নগরের নিউ গিরি রোডে আছে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েসান। টি নগরের গোপতি নারায়ণস্বামী স্ট্রীটের কাছে আছে তিরুমালাই পিল্লাই রোড। আর তার কাছেই আছে নিউ গিরি রোড। চেন্নাই ভ্রমণের উপযুক্ত সময় হল, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

এর পরে আমাদের গন্তব্যস্থল হল, চেন্নাই স্নেক পার্ক। গিন্ডি অঞ্চলে এই সরীসৃপ আলয়টি দেশের প্রথম স্নেক পার্ক। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই চিড়িয়াখানাটিতে আছে ৩০ রকমের সাপ, কয়েক প্রজাতির কুমির, কচ্ছপ ও গোসাপ। এখানে তোমরা লাউডগা, কালনাগিনী, ঢোঁড়া, কালকেউটে প্রভৃতি নানান রকমের খরিস র‍্যাট স্নেকের মত বিষহীন ও বিষধর সাপ, দু-ফুট থেকে চার ফুট লম্বা গোসাপ দেখতে পাবে। তোমরা সব থেকে অবাক হয়ে যাবে চার ফুট লম্বা গোসাপ দেখে। অদ্ভুত চেহারার এই প্রাণীগুলো এঁকে বেঁকে হাঁটা আর মুখ দিয়ে সাপের মতো চেরা জিভ বের করে।

চেন্নাইয়ের অন্যতম আকর্ষণ হল এখানের দোকানপাটগুলি। মধ্য চেন্নাইয়ের নর্থ উসমান রোড , সাউথ উসমান রোড হল প্রায় দুই কিলোমিটার লম্বা ও এর দুধারে রয়েছে নানান রকমের দোকান। এর ডান দিকে আছে পনগল পার্ক ও এক কিলোমিটার লম্বা পান্ডি বাজার। নানান রকমের কাপড়ের দোকান ছাড়াও আছে গয়নার দোকান এ রেস্তোরাঁ।

চেন্নাই থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে আছে মহাবলীপুরম বা মামল্লপুরম। এখানে আছে সমুদ্রতীরে ৫ম শতক পল্লব বংশের রাজা মহেন্দ্রবর্মণ দ্বারা নির্মিত দুটি মন্দির (সৈকত মন্দির) দৌপদী ও পঞ্চপান্ডবদের সম্মানে নির্মিত ছয়টি ছোট ছোট মন্দির। পাথরের গায়ের সুন্দর সুন্দর কারুকাজ ও খোদিত মূর্তি। একটি ছোট গুহা মন্দিরও আছে যা দেখে তোমরা বিস্মিত হবে। এখানেই রয়েছে থাকার ও খাবার হোটেল। সৈকত মন্দির দুটি নিরেট ও এগুলি নমুনা হিসেবে তৈরি হয়েছিল, তাই এগুলোতে পুজো হয় না। পাথরের কারুকার্য গুলিতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের নানান ঘটনা দেখানো হয়েছে। মা দুর্গার একটি খোদিত মূর্তি দারুণ সুন্দর।

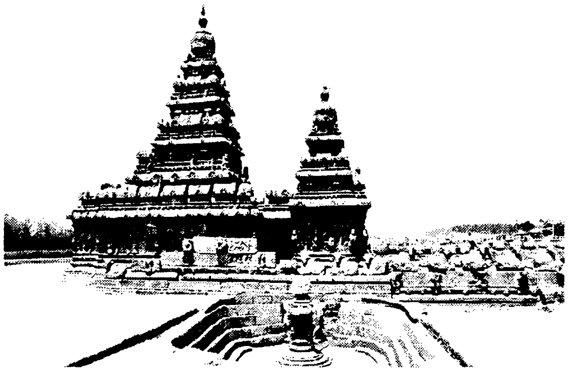

ভিজিপি গোল্ডেন বীচ হল সমুদ্রতীরে এক মনোরঞ্জনের জায়গা। এখানে আছে নানান রকমের নাগরদোলা, খাবারের দোকান । চেন্নাইয়ের কাছের জায়গাগুলি হল তীর্থস্থান কাঞ্চীপুরম, মুট্টুকাড়ু বোট হাউস, ক্রোকোডাইল পার্ক প্রভৃতি। তামিলনাড়ু পর্যটন দ্বারা পরিচালিত ট্যুরে এই সব স্থান গুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া চেন্নাই সিটি ট্যুর এও বেড়াতে পারো। তবে তোমরা যদি অন্য স্থানগুলি দেখতে চাও, তাহলে অন্ততঃ চারদিন থাকতে হবে ও ট্যাক্স বা বাসে ঘুরতে হবে। কাঞ্চীপুরম ট্রেনেও যাওয়া যেতে পারে। অন্যান্য স্থানগুলির মধ্যে আছে পক্ষী তীর্থম (তিরুকালকুভ্রম), বেদানথঙ্গল পক্ষী আলয় (বার্ড স্যাংচুয়ারী) ও বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মন্দির নিত্য কলন্যান পেরুমাল। এই জায়গাগুলি চেন্নাই থেকে ৩০ ও ৪০ কিমির মধ্যে অবস্থিত। পক্ষীতীর্থমে দিনের বিশেষ সময়ে দুটি চিলকে প্রসাদ নিবেদন করা হয়। বিশ্বাস অনুসারে মা দুর্গা ও শিব ঠাকুর কৈলাস থেকে চিলের রূপ ধারণ করে প্রথমে রামেশ্বরমে ও পরে এখানে খাবার খেয়ে আবার কৈলাসে ফিরে যান।

ভবসিন্ধু লাহিড়ী আমাদের ভূগোল পড়াতেন। তিনি কেমন পড়াতেন সেটা পরে বিচার্য। সবার আগে যেটাতে তিনি বিখ্যাত ছিলেন তা হল তাঁর টিয়া পাখির মত একখানা দুর্দান্ত নাক। পঞ্চম শ্রেণিতে স্কুলে ভর্তি হয়ে দেখলাম উপরের ক্লাসের দাদারা সবাই এই টিয়া-নাক নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের হাসাহাসি করে। এমনকি আড়াল থেকে দু'একজন বদমাশ ছাত্র বিকৃত সুরে টিয়া..টিয়া..টিয়া...বলে হাঁকও পাড়ে। তা শুনে মাস্টার মশাই কোন ছাত্রকেই রেয়াত করতেন না। দঙ্গলের মধ্যে এলোপাথাড়ি বেত চালিয়ে দিতেন। বলাই বাহুল্য বদমাশ ছেলেগুলো ততক্ষণে হাওয়া হয়ে যেত। আর নিরীহ দু'একটি ছেলে মার খেত। আমিও দু'একবার মার খেয়েছি।

ভবসিন্ধুবাবুর একটি বিশেষ গুণ ছিল। পরীক্ষার হলে যে সমস্ত ফেলুমার্কা ছেলেরা টুকলি করত তাদের তিনি পটাপট ধরে ফেলতে পারতেন। হেডস্যার নিখিলবাবু তাই ভবসিন্ধুবাবুর উপর অনেকখানি নির্ভর করতেন। পরীক্ষা চলাকালীন স্যার ব্ল্যাকবোর্ড পিছনে রেখে একমনে খবরের কাগজ পড়তেন। ভাবটা এই "ছাত্ররা যা খুশি করুক আমার তাতে কোনও মাথাব্যথা নেই।" কিন্তু কার্যত দেখা যেত ভবসিন্ধুবাবু মাঝেমধ্যেই খবরের কাগজ এক ঝটকায় টেবিলে ফেলে রেখে কোন কোন ছাত্রের পকেট সার্চ করতে চলে যেতেন। সেই ছাত্ররা ভাবতেই পারত না স্যার কী করে বুঝে ফেলছেন ওরা টুকলি করছে। ঐ ছাত্রদের নিঃস্ব করে স্যার টুকলির কাগজপত্র কেড়ে নিতেন।

একবার ক্লাস নাইনের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার সময় ভূগোল স্যার ভবসিন্ধুবাবু যথারীতি হাতে একখানি খবরের কাগজ নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢুকলেন। সব ছেলেদের সাবধান করে দিয়ে তিনি বললেন, "আজ ভূগোলের পরীক্ষা। কেউ অযথা গোল করবে না। আর যাদের কাছে টুকলি আছে তারা বাইরে গিয়ে সেসব ফেলে দিয়ে এসো। আমি যাকে হাতে নাতে ধরব তাকে কিন্তু ক্লাস থেকে বের করে দেব।" এই বলে তিনি খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। আমার পাশেই বসে ছিল গুরুপদ নামের একটি ছেলে। ভূগোলর প্রশ্নপত্র দেখে বেচারা পুরোপুরি ঘাবড়ে গিয়েছিল তাই উসখুস করছিল কখন জামার আস্তিন থেকে টুকলিগুলো বের করে ঝেড়ে ফেলবে। স্যার খবরের কাগজ পড়ছেন দেখে গুরুপদ তার কাজ শুরু করে দিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলে তবে তো ! স্যার কি যাদু জানেন ? না হলে সোজা তাকেই কেন এসে এক গাট্টা মারবে ? গুরুপদর টুকলি কেড়ে নিতে ক্লাসের অন্যান্য ফেলুরাও আর কেউ এখান সেখান থেকে টুকলি বের করার সাহস দেখালো না।

আমাদের কৌতূহল চরমে উঠল। স্যার কীভাবে বুঝতে পারলেন যে গুরুপদ আস্তিনে টুকলি লুকিয়ে রেখেছে ? এর উত্তর পেয়েছিলাম অনেক পরে। ক্লাস টেনের ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় আমার বন্ধু তারাপদ সেই গভীর রহস্য আবিষ্কার করে।

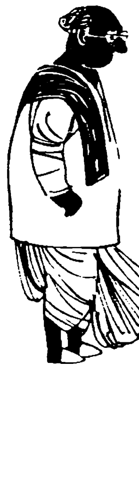

স্যার খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ফেললেও তিনি কাগজ পড়তেন না মোটেই। খবরের কাগজের ঠিক মাঝখানে পেন দিয়ে খুব ছোট্ট একটি ছিদ্র করে নিতেন। তারপর সেই ছিদ্র পথে ছাত্রদের নিরীক্ষণ করতেন। ছেলেরা দূর থেকে বুঝতেই পারতো না যে স্যার তাদের উপর তীক্ষ্ন নজর রেখেছেন।

অবশ্য ভবসিন্ধুবাবুর ঐ প্রিয় কায়দাটা তারাপদ ধরে ফেলেছিল বলে স্যারের হাতে তাকে বেশ কয়েকখানা রাম গাট্টা খেতে হয়েছিল এবং বলাই বাহুল্য আমরাও স্যারের সেই রাম গাট্টাগুলো চিরদিনের মতো মগজের হার্ডডিস্কে সেভ করে রেখে দিয়েছি।

রামগাট্টা

তরুণকুমার সরখেল

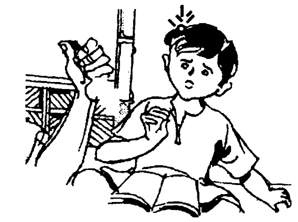

ইচ্ছে খুশির মিষ্টি ছড়া ঃ স্বপনকুমার বিজলী

ছোটদের কচিপাতা, ৩৪, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯। মূল্যঃ ৮০ টাকা।

যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের আনন্দমেলা, কিশোর ভারতী, শিশুমহল, ছেলেবেলা, ছোটদের কচিপাতা, টুকলু, সঞ্চিতা প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়াকারের পঞ্চাশটি কাব্যিক নৈপুণ্যতায় পূর্ণ ছড়া রয়েছে এই ইচ্ছে খুশির মিষ্টি ছড়া বইটিতে। পাঁচু বুড়ি দিচ্ছে বড়ি/কাপড় পেতে/ হলুদ ফুলে ভরে গেছে/সর্ষে খেতে।/ চোখ ফোটেনি কাঁদছে শীতে /কুকুর ছানা/ কুলগাছেতে ঝুলছে নোটিস/ পাড়তে মানা। নিঁখুত একখানি গ্রামের ছবি। সেখানে শীতে ছোট্ট কুকুর ছানার কান্নাও নজর এড়ায়নি কবির। আবার 'গাঁয়ের ভোলা' ছড়ায় ফুটে ওঠে চূড়ান্ত বাস্তবতার ছবিঃ ...মাঝে মধ্যে যায় সে গ্রামে /পড়লে ভীষণ দায় / গাঁয়ের মানুষ দেখলে ঘৃণায় নাক খানা সিঁকটাকায়। অঞ্জন বসুর অসাধারণ প্রচ্ছদ নজর কেড়ে নেয়। পার্থ মৈত্রর অলংকরণ ছড়িয়ে রয়েছে বইটির পাতায় পাতায়।

ভবানীবাবুর ছন্দে গড়া আবৃত্তির শ্রেষ্ঠ কবিতা ও ছড়া ঃ ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ও সুচিত চক্রবর্তী

জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, সি-৮, কলেজ স্ট্রিটমার্কেট (দ্বিতল), কলকাতা- ৭০০ ০০৭। ১২৫ টাকা।

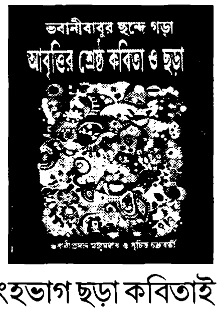

বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে সারা পৃথিবীর দুস্থ-নিপীড়িত শিশু ও কিশোরদের উদ্দেশ্যে। বলিষ্ঠ ছড়াকার শ্রী ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ও প্রবীণ ছড়াকার ও কবি সুচিত চক্রবর্তীর অজস্র কমেডি ও সিরিয়াস কবিতা ও ছড়া স্থান পেয়েছে দুই মলাটে। সংকলনের সিংহভাগ ছড়া কবিতাই আবৃত্তিযোগ্য। বিশেষ করে শ্রী মজুমদারের ভালো লাগে, শিয়রে শমন, বাঘাড়ম্বর, ভূত ক্যুইজ, কলকাতার কড়চা, হারিয়ে গেল, যায় হারিয়েই ছেলেবেলা ও শ্রী চক্রবর্তীর একটি ছেলে একটি মেয়ে, ধান শালিখের দেশ, মাতৃভাষা, ভুলে গেছি খেলা, ইংলিশ মিডিয়ামে, ভীষণ চাপে, চাইল্ড কেয়ার, খোকা ও মালি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাছাই কিছু কল্পবিজ্ঞান ঃ সম্পাদনা - শুভজিৎ বরকন্দাজ

পানকৌড়ি প্রকাশনী, হৃদয়পুর, কলকাতা- ১২৭। মূল্য ২৫০ টাকা।

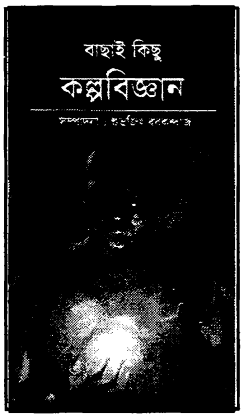

ঊনত্রিশটি সাই-ফাই কল্পবিজ্ঞানের গল্প। সম্পাদকের ভাষায় - প্রবীন-নবীনের এক সুরেলা কাল্পিক যুগলবন্দী এই বাছাই কিছু কল্পবিজ্ঞান। শুরু করার আগে শুরু করেছেন সৌভিক চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন- অনেকে মনে করেন কল্পবিজ্ঞানের গল্প মানেই বিজ্ঞানের কচকচি, কঠিন কঠিন সূত্রের প্রয়োগ, জটিল পরিভাষার ছড়াছড়ি। বাস্তব ছবিটা কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। কল্পবিজ্ঞানের মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই একমত হবেন- যন্ত্র নয়, মানুষই এই সাহিত্যধারার মূল চালিকাশক্তি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া সায়েন্স ফিকশন অসম্পূর্ণ। বইয়ের প্রচ্ছদ, বাঁধাই ও কাগজের মান বইটির গুরুত্ব অনেকগুণ বাড়িয়েছে ফলে এটি একটি সংগ্রহযোগ্য চমৎকার সংকলন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ভূতগুলো সব জ্যান্ত ঃ জগদীশ মন্ডল

ছোটদের কচিপাতা, ৩৪, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯। মূল্য-৫৫ টাকা।

শুরুতেই জমজমাট ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের ভূমিকা মাত করে দিয়েছে। ভূতগুলো সব জ্যান্ত গোটা-দুই ধ'রে দ্যান্ তো এই শিরোনামের ছড়াটি পড়ে জগদীশ বাবুর মজাদার ছড়ার বইটির ভেতরের লেখাগুলি সম্বন্ধে সম্যক আভাষ পাওয়া যাবে। স্কুল শিক্ষক ব্রহ্মদত্যি ছাত্র ভূতের ছানা / ভোর অবধি পড়ান তিনি বিষয় আছে নানা। এই ধরনের মজাদার ছড়া পড়তে কে না ভালোবাসে। ভূতের কান্ড শেষ, ভূতের রাজার পণ, প্রাইজ পাবে, তিনটি ছানার ইচ্ছে, ভূতের চিঠি, ভূতের রাগ, প্রতিকার, রাগ করে প্রভৃতি ছড়া ছোট বড় সকলেরই ভালো লাগবে। প্রচ্ছদ ভয় ধরানো। এঁকেছেন - পল্লব মন্ডল।

রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে
আমাকে স্মরণ করিও আমি রক্ষা করিব।

BABALOKENATH COMPUTER & OFFSET PRINTING MATH

All types of Offset Printings & Multi Colour Job done here.

Prop. Rajesh Rewani

Mobile : 9475324474

MUNICIPALITY COMPLEX, ROOM NO. A-13, 1ST FLOOR
B.T. SARKAR ROAD, PURULIA

সঞ্চিতার ছোট্ট বন্ধুরা,

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। বর্ষা শেষ হতে না হতেই কাশফুলের দল মাথা নাড়তে শুরু করেছে, নদী-পুকুর জলে টইটম্বুর। প্রকৃতি সেজে উঠেছে একেবারে নতুন করে।

এবছর অতি বৃষ্টির কারণে অনেক জেলাতেই বন্যায় ভেসে গেছে ঘর-বাড়ি মানুষজন। মায়ের আগমণ বার্তায় তাঁদের মুখে হয়তো সেভাবে খুশির রেশ থাকবে না। কিন্তু আমাদের আশা তাঁরা আবার নতুন উদ্যোমে গড়ে তুলবেন তাঁদের বাসস্থান, রাস্তা ঘাট সব। ফসলে ঢেকে যাবে মাঠ-ঘাট। দশভূজা তাঁদের সহায় হোন।

সঞ্চিতার জন্য এবার অনেক গুলো কমিক্স এঁকে দিয়েছেন পত্রিকার আপনজন শ্রী প্রণব হোড়। এছাড়া ভালো ভালো গল্প ছড়া কবিতাতো আছেই। পুজোর ছুটিতে পড়ে ফেলো কেমন। সবাই ভালো থেকো।

-- সম্পাদক বন্ধু